সম্পাদকীয়

বিশ্বশান্তি পরিষদ ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদকে ভূষিত করে। এ মহান অর্জনের ফলে জাতির পিতা পরিণত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ব বন্ধুতে। প্রিয় নেতা শান্তির পায়রার মতো ডানা মেলে ছায়া দিচ্ছিলেন দেশকে। রাক্ষস-খোক্ষসের মতো ভয়ানক শত্রুরা, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি, বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াক তা চায়নি, তারাই ঘটিয়ে দিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। সেই কালরাতে মুখ থুবড়ে পড়লেন শান্তির সেই পায়রাটি। তারপর বহুকাল কেটে গেছে দুঃসহ কষ্টে। বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শান্তির পায়রা ডানা মেলে বসেছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মূল্য : ২০.০০ টাকা

সূচি

নিবন্ধ

৪ পায়রাগুলো নিঝুম যখন/ মনি হায়দার
১২ খোকা থেকে জাতির পিতা/ ইব্রাহিম নোমান
১৮ বঙ্গবন্ধুকে আমি কাছ থেকে দেখেছি/মীর জামাল উদ্দিন
২৫ কী ভয়ানক ২১ শে আগস্ট!/ ইমরান পরশ
২৭ ৬ই আগস্ট হিরোশিমা দিবস
লিটল বয় থেকে ফ্যাটম্যান/ মো. শিপলু জামান
৩৪ বার্লিন দেয়ালের এক টুকরো/ নাসরীন মুস্তাফা
৩৬ বর্ষার ছন্দে ছন্দে/ আবু আফজাল মোহাঃ সালেহ
৫২ স্মার্ট ফোনে তোমার অ্যাপস/ শাহ আকবর আহমেদ শুভ
৫৮ পৃথিবীর প্রাচীন মেলা/ রফিকুল ইসলাম রফিক

ভিনদেশি ভাষার গল্প

৪৪ দাদু বাড়িতে/ মূল : নিকোলাই নসোভ
ভাষান্তর : আবুল বাসার

গল্প

২২ পারি ও তার বন্ধু/ জ্যোৎস্নালিপি
২৯ শান্তির দূত/ জয়া সূত্রধর
৩৮ মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি/ আবুল কালাম আজাদ
৪৮ দুষ্টুদেরও বুদ্ধি আছে/ মোহাম্মদ অংকন

ছোটোদের লেখা

১৬ ঘুরে এলাম টুঙ্গিপাড়া/ শেকসপীয়ার কায়সার
৬০ স্বপ্নে মেঘের মাঝে/ সংহতি সরকার

নদী ধারাবাহিক

৫৪ ধলেশ্বরীর দিনরাত্রি/ মীম নোশিন নাওয়াল খান

নতুন পড়ুয়াদের জন্য সহজ গপ্‌প

৫৬ তুলতুলে মুরগির বাচ্চা/ হাসান রাউফুন

প্রতিবেদন

৫১ গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের প্রথম স্বর্ণ
মেজবাউল হক
৫৫ সদা সত্য বলিবে/ সুলতানা বেগম
৬১ শহিদদের স্মরণে ত্রিশ লাখ গাছ রোপণ
শাহানা আফরোজ
৬২ মোবাইলে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৬২ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ‘জয়’/ জান্নাতে রোজী
৬৩ ঋতু পরিবর্তনে অসুখবিসুখ/ মো. জামাল উদ্দিন
৬৪ নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর/ সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি

কবিতার হাট

০৩ ওয়াসিফ-এ-খোদা
০৯ আমীরুল ইসলাম
১০ রহীম শাহ/ রাশেদ রউফ
১১ শাফিকুর রাহী/ আমিরুল হক
১৫ আলম তালুকদার/ লুৎফর রহমান সরদার/ এমরান চৌধুরী
১৭ সোহরাব পাশা/ মুহম্মদ আহনাফ সিদ্দিক/ আলমগীর কবির
২১ জুনায়েদ তৌহিদ/ মো. রাইয়ান হোসেন
২৪ হামিদ আবরার/ তৌহিদ-উল ইসলাম
৩৩ তাহমিনা কোরাইশী/ শারমিন জিকরিয়া
সাকিব সাকলায়েন
৩৭ শরীফ আব্দুল হাই
৪৩ নিপু শাহাদাত
৫৭ লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

আঁকা ছবি

২য় প্রচ্ছদ: মো. তাহ্‌মিদুল হক তাসিন/ সুমাইয়া আহমেদ এশা
শেষ প্রচ্ছদ: আনিকা তাসনিম/ রুজাবা তাহসিন তুবা
৩৭ ওকি
৪০ আহ্‌নাফ হাসান চৌধুরী
৪৭ নবনীল আহমেদ
৫৯ কৃণন মাহমুদ নিয়োগী
৬৪ আয়ান হক ভূঁঞা

শিল্পনির্দেশক
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

পায়রা ও প্রিয় নেতার গল্প

ওয়াসিফ-এ-খোদা

সাদা রং পায়রাগুলো
বাতাসে সাঁতার কাটে
খুশিতে বাকুম বাকুম
উঠোনে নামে, হাঁটে।

বত্রিশে নেতার বাড়ি
সেখানেই জীবনযাপন
বাঙালির শিরোমণি
ওদেরও কত আপন।

দেখা হয় নেতার সাথে
প্রতিদিন ভোরবেলাতে
তখনই মেতে ওঠা
কাঁধে তাঁর কিংবা হাতে!

আদরে নেতা ডাকেন
‘দেখে যা কী পাগলামি
ওরাও সোহাগ বোঝে
ওরা খুব শান্তিকামী।’

দৌড়িয়ে রাসেল আসে
কখনো হাসু আপা
মামণি খাবার দিলেই
ঝাঁপটানো ডানা কাঁপা।

নেতা যে ব্যস্ত থাকেন
দেশ নিয়ে ভাবনা যত
মানুষকে ভালোবাসেন
প্রিয়জন কে আর তত।

স্বাধীন এক ভূখণ্ড দিতে
চেয়েছেন বাঙালিকে
সাফল্য পেতেই সাড়া
পড়েছে দিকে দিকে।

বাংলাদেশ ভাষার মিলন
মেলা ভার এমন জুড়ি
নেতা শেখ মুজিব পেলেন
শান্তিতে ‘জুলিও কুরি’।

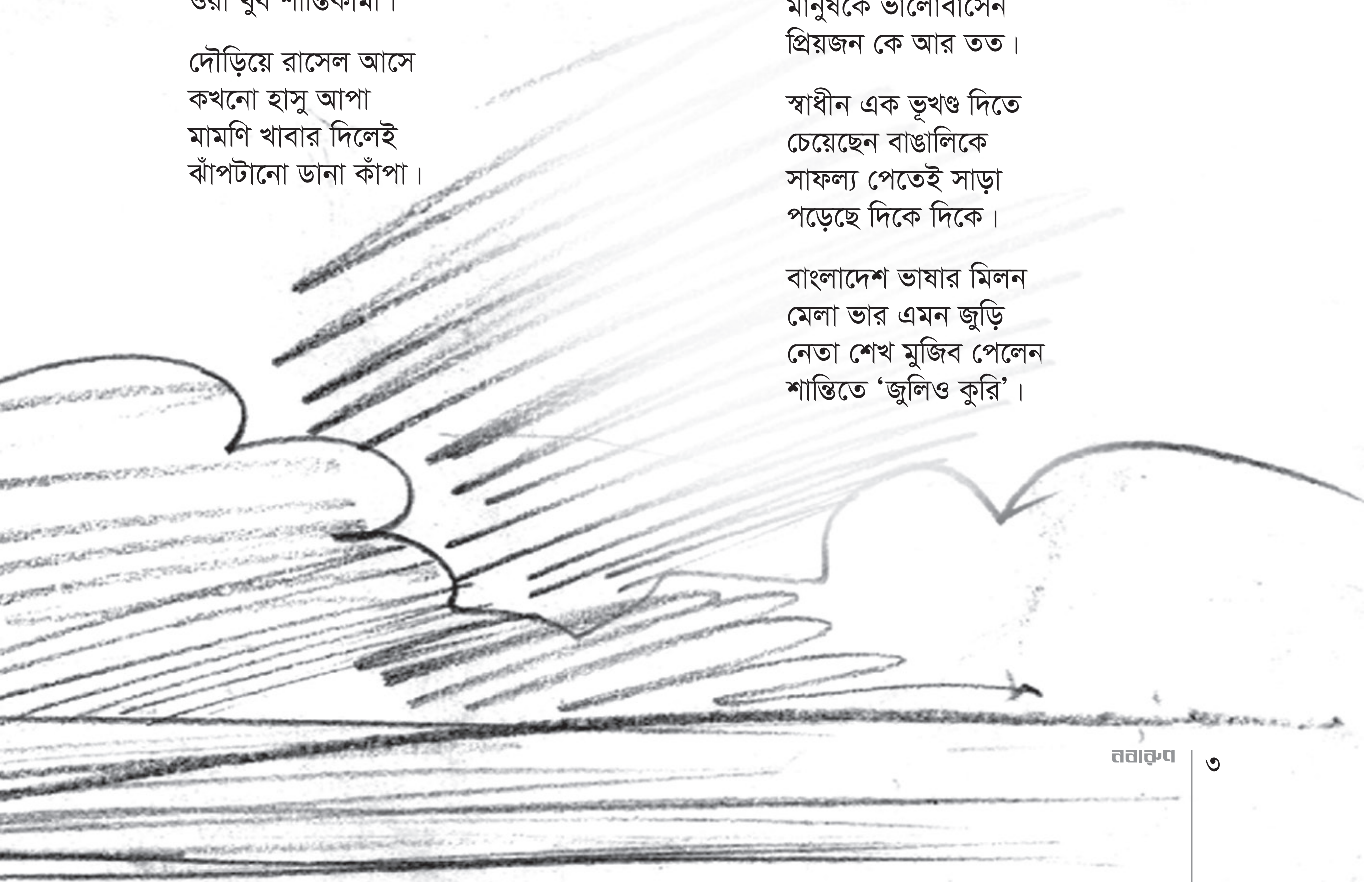

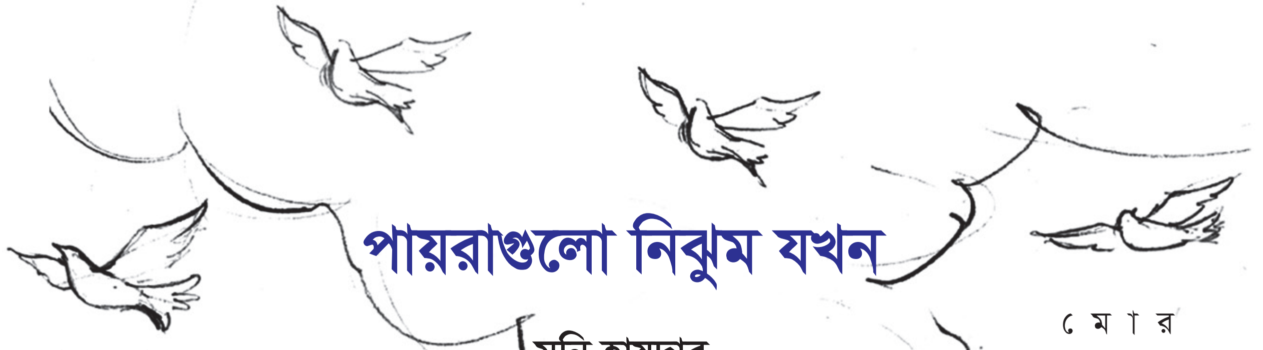

পায়রাগুলো নিঝুম যখন

মনি হায়দার

উড়তে উড়তে পায়রাগুলো যখন প্রায় ক্লান্ত, ঠিক তখনই দেখতে পায় একটি বাড়ির উঠোনে ধান শুকোতে দেওয়া হয়েছে। মা পায়রা ডানা প্রসারিত করে পিছনে ফেরে, মাকে পিছনে ফিরতে দেখে বাকি পায়রাগুলো থেমে যায়। পায়রাগুলোর মধ্যে বড়োটা ওদের মা। মা বলল, অনেকক্ষণ উড়েছি। এবার নিচে নামি, দেখি খাওয়াদাওয়ার কোনো উপায় করা যায় কি না!

মেজ পায়রা ডানা ঝাঁপটায়, মা ঠিক বলেছ। বড্ড খিদে পেয়েছে।

আর বকবক করার দরকার নেই, নিচে নামো, মা বাতাসে ডানা মেলে দিয়ে গোত্তা খেয়ে নিচের দিকে নামছে। মায়ের দেখাদেখি ছোটো-বড়ো-মেজো-সেজো বড়ো পায়রা সবাই নিচে নেমে, উঠোনের এক পাশে দাঁড়ায়। মা পায়রা চারদিকে সতর্ক গলা বাড়িয়ে সব কিছু দেখে ইশারা করলে, বাচ্চা পায়রাগুলো ধান খেতে আরম্ভ করে। দূরে, চৌচালা ঘরের ছায়ায় বসে ধান পাহারা দিচ্ছে নিবু। নিবুর কোলে তিন বছরের তিবু আর ওর পায়ের কাছে ছড়ি। নিবু দেখতে পাচ্ছে, পায়রাগুলো গপাগপ ধান খাচ্ছে, কিন্তু তিবুরে কোথায় রেখে ছড়ি তুলবে?

মা?

রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয় মা আসমা বেগম, কী অইচে?

কইতরে ধান খাইতেছে।

লাড়ি দিয়া খেদাইয়া দে–

কেমনে খেদামু। মোর কোলে তো তিবু।

অরে নিচে বহাইয়া রাখরে বাজান।

মা, ওরে মাডিতে বহাইলে কান্দে–আইচ্ছা, মুই আইতেছি।

মা পায়রা নিবু, তিবুর মায়ের আসার সংবাদ পেয়ে আবার আকাশে ডানা মেলে দেয় ছেলেপেলেদের নিয়ে। রান্নাঘর থেকে ছাইমাখা মুখে বের হয়ে আসে নিবুর মা আসমা বেগম, পয়ারারা কই?

উইড়া গেছে মা।

আইচ্চা, তুই তিবুরে আমার কোলে দে, আসমা বেগম তিবুরে কোলে নিয়ে নিবুর দিকে তাকায়, ভালো কইরা ধান পাহারা দে বাজান।

আইচ্চা! হাতে ছড়ি নেয় নিবু।

ওদিকে সাদা আকাশে উড়ে চলেছে পায়রার ঝাঁক। এই পায়রারা এসেছে কোকাব শহর থেকে। কোকাব

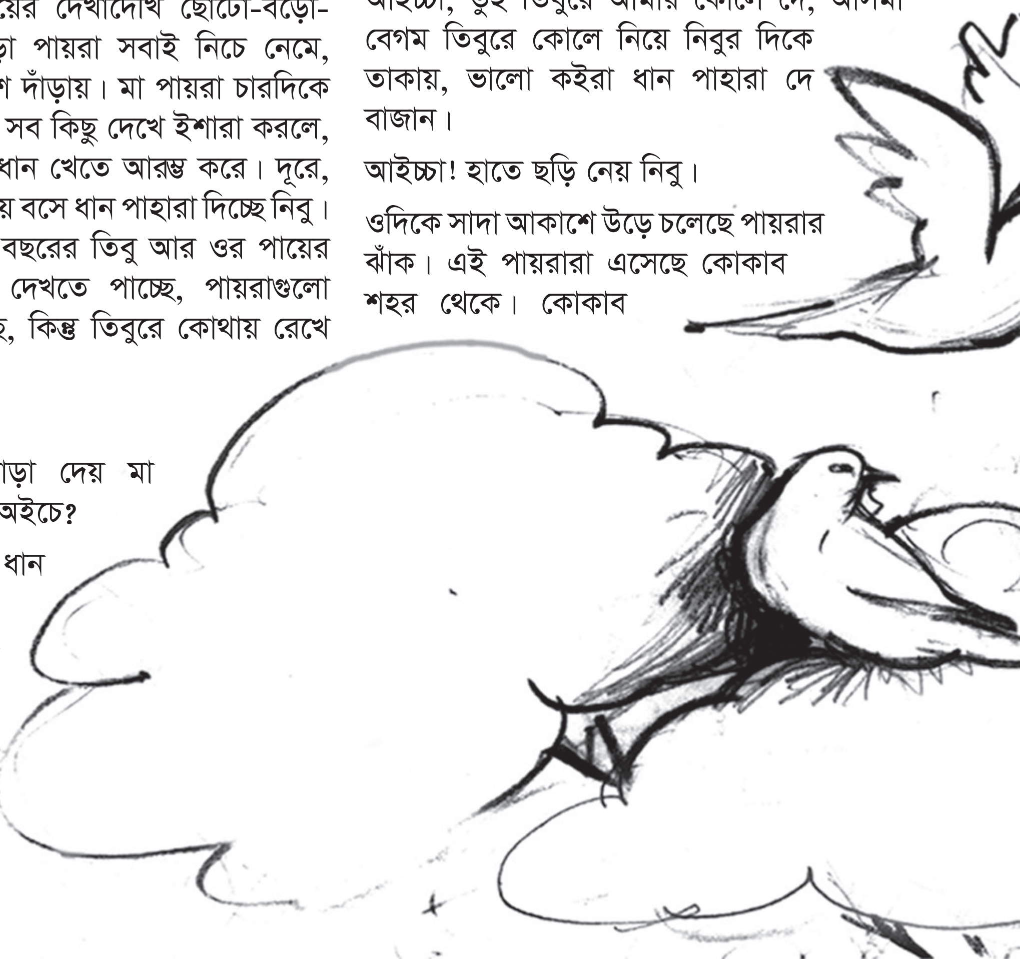

হলো ডানাকাটা সাদা পরিদের দেশ। সেই দেশের পায়রারা গত রাত থেকে উড়তে শুরু করেছে। প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পথ পাড় হয়ে মাত্র বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মা পায়রা সবচেয়ে ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু ভাবনায় থাকে। ছোটোটা বেশি কিচিরমিচির করে, বড়োদের সঙ্গে ঝগড়া করে। অবশ্য যখন স্বাভাবিক থাকে, তখন সবার চেয়ে ভালো আর ভদ্র।

মা?

ছোটো পায়রার খসখসে গলা। মা পায়রা উড়তে উড়তে ফিরে তাকায়, কী?

আমরা যাচ্ছি কোথায়?

দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে জবাব দেয় মা,এক রাজার বাড়ি।

সেই রাজার বাড়ি কোথায়? বিরক্তি মেজো পায়রার গলায়, কাল রাত থেকে উড়ছি। আর কত উড়ব? হাই তোলে ও,আমার ঘুম পাচ্ছে–

আমারও ঘুম পাচ্ছে, হাই তোলে সেজো পায়রা।

আর একটু.. আমরা পৌঁছে যাব রাজারবাড়ি.. মা পায়রা একটু দ্রুত চলার গতি বাড়িয়ে দেয়।

আর কত দূর! দলের রাগি পায়রা প্রশ্ন করে দলের নেতা পায়রাকে।

বুড়ো পায়রা চঞ্চু দিয়ে আদর করে উড়তে উড়তে রাগি পায়রাকে বলে, এই তো দাদু আমরা চলে এসেছি। আর ধরো এক ঘণ্টার মধ্যে রাজার বাড়ি পৌঁছে যাব।

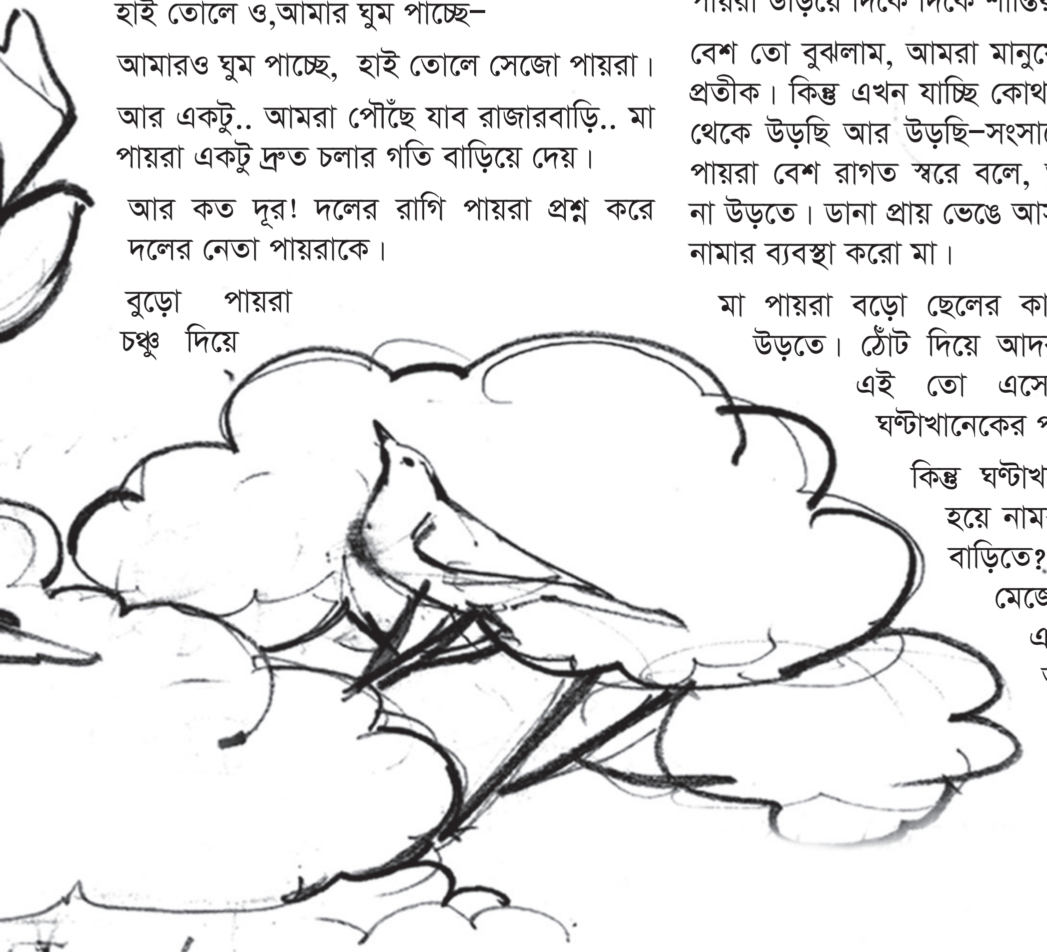

সত্যি বলছ? প্রশ্ন করে কোমর বাঁকা পায়রা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলার বাহিনীর একটা গুলি লেগেছিল ওর কোমরে। সে কী যন্ত্রণা! ডাক্তার দু' ঘন্টা ধরে অপারেশন করে গুলিটা বের করতে পারলেও, বাঁকাটা কমাতে পারেনি। কিন্তু উড়তে বা শিকার করতে কোনো অসুবিধা হয় না ওর।

হাসে মা পায়রা, আমরা কী কখনো মিথ্যা বলি?

না, মাথা নাড়ায় ডানে আর বামে, আমরা পায়রারা শান্তির প্রতীক। আমরা কখনো মিথ্যা বলি না। প্রতারণা করি না। শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে থাকি।

রাইট, কানের খুব কাছে চলে আসে বাবা পায়রা, এই জন্যই পৃথিবীর মানুষেরা আমাদের ভালোবাসে। পছন্দ করে। কোনো অনুষ্ঠান হলে পায়রা উড়িয়ে দিকে দিকে শান্তির বারতা পাঠায়।

বেশ তো বুঝলাম, আমরা মানুষের কাছে শান্তির প্রতীক। কিন্তু এখন যাচ্ছি কোথায়? সেই দু-দিন থেকে উড়ছি আর উড়ছি–সংসারের বড়ো ছেলে পায়রা বেশ রাগত স্বরে বলে, আর তো পারছি না উড়তে। ডানা প্রায় ভেঙে আসছে। তাড়াতাড়ি নামার ব্যবস্থা করো মা।

মা পায়রা বড়ো ছেলের কাছে যায় উড়তে উড়তে। ঠোঁট দিয়ে আদর করে, বাবারে এই তো এসে গেছি। আর ঘণ্টাখানেকের পথ মাত্র।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পথ পাড় হয়ে নামব কোথায়? কার বাড়িতে? জানতে চায় মেজো মেয়ে পায়রা। এই পায়রাটা আবার কঠিন স্বভাবের। ও কাউকে তেমন

পছন্দ করে না। কেবল বাবা পায়রার সঙ্গে ওর যত ভাব। মেজো মেয়ের কাছে এগিয়ে যায় বাবা, কী হয়েছে আমার মামনিটার?

মেজো পায়রা মেয়ে বাবার গলায় নিজের গলা রাখে। বাবা খুঁটে একটু আদর করে দেয়। খুব খুশি হয় মেজো পায়রা মেয়ে। কারণ, উড়তে উড়তে ঠোঁট দিয়ে আদর করা কঠিন। সবাই উড়তে থাকে ডানা ঝাঁপটিয়ে। সেই সময়ে কী আদর করা যায়? কিন্তু মেজো মেয়ে পায়রাকে খুব ভালোবাসে বাবা পায়রা। একটু রিসক নিয়েই মেজ পায়রাকে আদর করে বাবা বলে, শোনো মেয়ে-আমরা নামতাম বাংলাদেশের চমৎকার একটা বাড়িতে। যে বাড়িতে নামতাম সেই বাড়িতে আমাদের মতো অনেক পায়রা আছে। ওরা সেই বাড়িতে খুব আদরে থাকে। সেই সব পায়রাদের বাড়ির যে রাজা, সেই রাজা নিজের হাতে খেতে দেন। আর আছে ছোট্ট একটা রাজকুমার, সেই রাজকুমারও পায়রাদের আদর করে।

সেই রাজবাড়িতে গিয়ে আমরা কী করব? জানতে চায় সবচেয়ে ছোটো পায়রাটা।

মা বলেন, রাজবাড়িতে যে পায়রারা থাকে, সেই পায়রাদের মধ্যে বড়ো ছেলে পায়রার আগামীকাল বিয়ে। খুব ধুমধাম হবে। আমরা সেই বিয়েতে যাচ্ছি।

মা, বিয়েতে নাচগান হবে? পায়রাদের নাচুনে পায়রা এতক্ষণে মুখ খোলে।

শোনো মেয়ের কথা? বিয়েবাড়ি আর নাচ-গান হবে না? প্রচুর নাচ-গান হবে।

আমি কিন্তু ওই গানটার সঙ্গে নাচব।

কোন গানটারে? মা পায়রা জানতে চায়। মা পায়রার ভালো লাগছে, এতক্ষণে দলটার মধ্যে একটা চনমনে ফুর্তি ফিরে এসেছে।

ওই যে.. হলদি বাটো মেন্দি বাটো ... বাটো ফুলের মউ..

নিশ্চয়ই গাবি আর নাচবি। তোর মতো কেউ নাচতে পারে? তোর নাচের জন্যই তো আমাদের ওই দূরদেশে টেলিগ্রাম পাঠায়! মা বলে।

বাবা? উড়তে উড়তে পায়রাগুলো পার হচ্ছে বরিশালের ধানসিঁড়ি নদী। নদীর তিরতির পানির দিকে তাকিয়ে ডাকে অলস পায়রা।

কী?

ওই বিয়ে বাড়িতে কী আমরাই যাচ্ছি? না আরো পায়রারা আসছে?

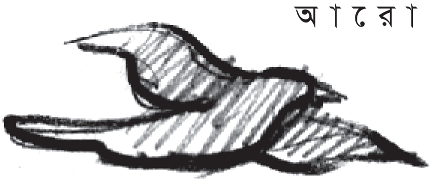

আসবে না মানে? পৃথিবীর নানা দেশের পায়রারা আসবে। বলা যায়, ওই রাজবাড়িটায় শান্তির প্রতীক পায়রাদের বিয়ে উপলক্ষে আমাদের একটা মহাসম্মেলন হবে। আর কত রকমের যে পায়রা আসবে চিন্তাও করতে পারবি না।

উড়তে উড়তে হঠাৎ থেমে যায় অলস পায়রা। মনে হচ্ছে ও অসুস্থ। এখনই নিচে পড়ে যাবে। মা পায়রা বাবা পায়রা দ্রুত অলস পায়রার কাছে এসে ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে বাছা? শরীর খারাপ?

নাহ-

তাহলে? মায়ের বিপন্ন প্রশ্ন, ডানা মেলে উড়ছ না কেন?

আমি তো জানতাম দুনিয়ায় আমরাই কেবল একমাত্র পায়রার জাত। কিন্তু তুমি বললে, আমাদের বাইরে আরো নানা জাতের পায়রা আছে। সেই পায়রারা দেখতে কেমন? আমাদের মতো?

বাবা পায়রা বলে, বলছি। তার আগে ডানায় হাওয়া লাগাও। নইলে যে মাটিতে পড়ে যাবে। আর একবার মাটিতে পড়ে গেলে উঠতে পারবে না। ডানায় হাওয়া লাগাও...

অলস পায়রা ডানায় হাওয়া লাগিয়ে বাবার পাশে উড়তে শুরু করে। সুদূর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসা পায়রার ঝাঁক তখন বরিশাল জেলা পার হয়ে ঢাকার কাছাকাছি চলে এসেছে। আর একটু পরই পাড়ি দেবে বুড়িগঙ্গা নদী। নিচে সবুজ গ্রাম ঘাসের গালিচা পেতে শুয়ে আছে চুপচাপ।

দেখো, দুনিয়ায় আমরাই কেবল এক জাতের পায়রা না। আরো অনেক পায়রা আছে। যেমন ধরো মাথায় ঝুঁটি আছে এক জাত পায়রার। আর এক জাতের পায়রা আছে,যারা অনেকটা ময়ূরের মতো পেখম তুলে থাকে।

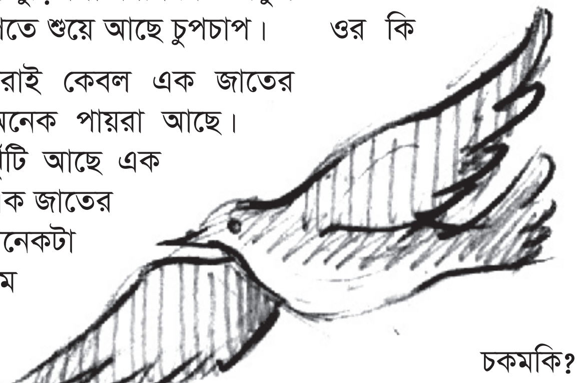

আমরা আকারে মাঝারি, কিন্তু এক ধরনের পায়রা আছে, আকারে আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো...

আমরা এখন বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিচ্ছি... মা পায়রা উল্লাসের সঙ্গে বলে, এই তো এসে যাচ্ছি আমাদের সেই রাজার বাড়ি...।

আজমীর শরীফের উপর এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে তো উড়ছেই।

ওরা উড়ছে আর তাকাচ্ছে পূর্ব দিকে। আজমীর শরীফের পায়রারা সেই কোন সকালে প্রস্তুতি নিয়েছে, বিয়ে বাড়িতে যাবার। কেউ কেউ লাল রঙের শাড়ি পরেছে। কেউ হলুদ রঙের থ্রি পিস পরেছে। সবচেয়ে ছোটো পায়রা ঘাগরা পরেছে। এদিকে পায়রার দলের প্রবীণ সদস্য দাদু ঘন ঘন ঘড়ি দেখেছে... চোখে-মুখে বিরক্তি। সকাল সকাল যাত্রা করতে পারলে ভালো হতো। শ্রাবণের দিনে রোদ খুব তেতে থাকে। অবশ্য বাতাস থাকলে রোদ তেতে উঠলেও কোনো সমস্যা নেই। বাতাসের তোড়ে ডানায় রোদ পড়তে পারে না। সে যাই হোক, দাদু পায়রা সব অনুষ্ঠানে ঠিক সময়ে যেতে চায়। দাদুর ছেলে চকমকি পায়রা এখন দলের নেতা। চকমকি গেছে নদীতে গোসল করতে, এখনো ফিরছে না। ও না ফিরলে দলটা আকাশে ডানা মেলে দিতে পারছে না।

ওর কি কাণ্ডজ্ঞান হবে না? দাদু পায়রা চোখ থেকে বাইফোকাল চশমাটা কেবল নামিয়েছে, চকমকি পায়রা এসে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, চলো।

তোর এত দেরি হলো যে চকমকি? দাদুর গলায় বেজায় রাগ।

দেরি কী আর সাধে হয়েছে? নদীতে গোসল করতে গিয়ে দেখি সাদা বক আর কুমিরের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া। কুমির বলে, এই জায়গাটা আমার। আমি এখানে এসে রোদ পোহাই। শিকার করি। তুমি আমার জায়গা থেকে চলে যাও। না গেলে কিন্তু ভীষণ বিপদ হবে, জবাব দেয় চকমকি পায়রা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে।

সাদা বক কালো কালো লম্বা ঠোঁট নাড়িয়ে জবাব দেয়, বললেই হলো এটা তোমার জায়গা? এই জায়গাটা আমার দাদার দাদা আকবর বাদশার কাছ থেকে কিনেছে। আমার কাছে দলিল আছে–

বটে! দাদু বলে, কুমির কী করল?

কুমির কি আর লেখাপড়া জানে? কুমির গায়ের জোরে বলে, সাদা বক তুমি এই মুহূর্তে আমার জায়গা থেকে না গেলে তোমাকে কিন্তু খেয়ে ফেলব।

খাও তো দেখি, কেমন ক্ষমতা তোমার? সাদা বকের চ্যালেঞ্জে কুমির তো রেগে আগুন হয়ে বিরাট

হা মুখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরে সাদা বকের উপর।

সাদা বক নিশ্চয়ই শেষ? এতক্ষণ পেছনে দাঁড়ানো ছোটো মেয়ে পায়রা সামনের আয়নায় মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে বলে, কুমিরের অমন হা মুখের সামনে বোয়াল মাছ রেহাই পায় না। আর এত সামান্য সাদা বক!

আরে না, সাদা বক সামান্য হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিতে কুমিরের চেয়ে এগিয়ে অনেক বুঝলিরে ছোটো–

তাই? চিরুনি রেখে আয়নার নিজের চোখে কাজল দিতে দিতে তাকায় ছোটো পায়রা।

হ্যাঁরে ছোটো। সাদা বক ছোটো কিন্তু বুদ্ধিতে পাকা। সাদা বকের চ্যালেঞ্জে কুমিরের তো ইজ্জত যায় আর কী! ওদের ঝগড়ার মধ্যে নদীর তীরের পাখিরা, জলের মাছেরা, ডাঙার মাছি আর মশারা এসে হাজির মজা দেখতে। ওদিকে গর্তের মুখ থেকে মাথা বের করে ইঁদুর চুক চুক শব্দে বলে, কুমির এমনিতেই মোটা, ছোটো সাদা বকের সঙ্গে পারবে না। ইঁদুরের বলার সঙ্গে সঙ্গে কুমির দাঁতাল দাঁত আর গভীর হা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাদা বকের উপর। ঝাঁপিয়ে পড়ার সাত সেকেন্ড আগে সাদা বক উড়ে আর একটু দূরে বসে হাসে, এসো, এসো দেখি তোমার কত শক্তি হে কুমির।

সব পায়রারা চকমকি পায়রার কাছ থেকে কুমির আর সাদা বকের অবাক লড়াইয়ের ঘটনা শোনে আর ফিকফিক হাসে। ঠোঁট বাঁকা পায়রা জিজ্ঞেস করে, তুমি যাই বলো চকমকি পায়রা ভাই, কুমিরের সঙ্গে পারা অত সহজ নয়। যা ভয়ংকর মুখ আর বিকট হা ওর...

আরে শোনো শোনো ঠোঁট বাঁকা পায়রা, শেষে কুমিরের অবস্থা শোনো।

বলো।

ইঁদুরের কথায়, আর সাদা বকের উপহাসে রেগে মেগে কুমির আরো বেগে আক্রমণ করে, আর ছোটো সাদা বক আক্রমণের সাত সেকেন্ড আগে উড়ে সরে যায়, দূরে। কুমির আরো রেগে আক্রমণ করে ছোটো সাদা বককে, বক ঠিক সেই আগের মতো সাত সেকেন্ড আগে উড়ে সরে যায় দূরে।

দাদু চোখ থেকে বাইফোকাল চশমা নামিয়ে ফোকলা দাঁতে হাসে, বুঝতে পেরেছি রে বুঝতে পেরেছি। ছোটো সাদা বকের কাছে হেরে গেছে বোকা কুমির, নারে?

আরে শোনোই না বাবা,
কুমির ঝাঁপিয়ে পড়ে,
সাদা বক সরে যায়,
সাদা বক সরে যায়,
কুমির ঝাঁপিয়ে পড়ে..

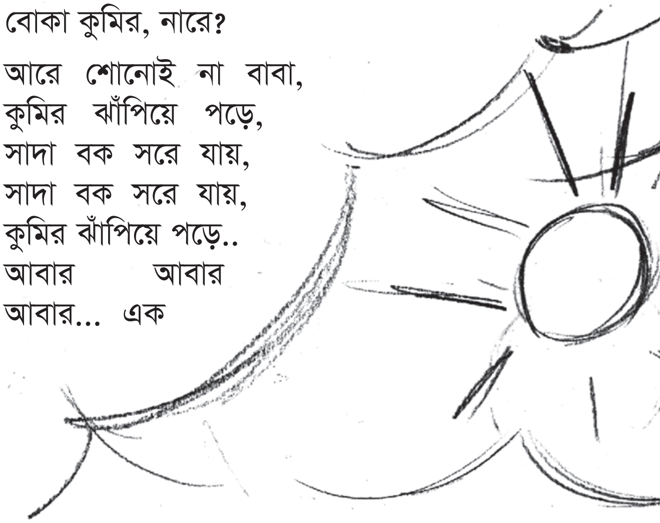

আবার আবার আবার... এক সময়ে নদীর পানি ঘোলা হয়ে যায়। নদীর মাছেরা, নদীর তীরের পাখিরা, গর্তের ইঁদুরেরা, মাঠের গরুর দল, জঙ্গলের হাতির দল, বনের মাছি আর মশারা, গরু-মহিষের রাখালেরা–সবাই এসে জড়ো হয়েছে। নদীর পানি ঘোলা হওয়ায় সবাই কুমিরের উপর রেগে যায়। কুমিরকে বলে, ঝগড়া থামাতে। কুমির তো কথা শোনে না, শেষে হাতি এসে ভয় দেখায়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে নদী ছেড়ে না গেলে পিষে মেরে ফেলবে। হাতির সঙ্গে কি আর কুমির পারে? শেষে মাথা নীচু করে নদী ছেড়ে সমুদ্রে চলে যায়...। সেই ঘটনা দেখে আসতে দেরি হয়েছে।

ঠিক আছে, এখন চল। দে উড়াল... আদেশ করে দাদু পায়রা।

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়... চকমকি পায়রা ডানা মেলে দেয় আকাশে, সঙ্গে সঙ্গে আজমীর শরীফের শত

শত পায়রা ডানা মেলে আকাশে...শোঁ শোঁ শোঁ...।

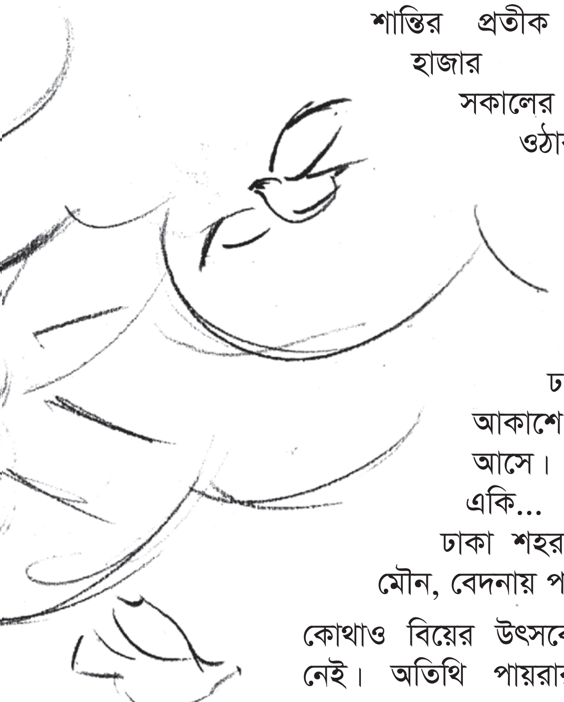

সব দেশের পায়রা, শত শত পায়রা, শান্তির প্রতীক হাজার হাজার পায়রা সকালের সূর্য ওঠার পবিত্র মুহূর্তে ঢাকার আকাশে চলে আসে। কিন্তু একি... গোটা ঢাকা শহর শোকে মৌন, বেদনায় পাথর।

কোথাও বিয়ের উৎসবের চিহ্ন নেই। অতিথি পায়রারা কিছু বুঝতে পারে না...। কোথাও কোনো গান নেই... সুর নেই... বিয়ের বাদ্য নেই...উল্লাস নেই, অতিথি পাখিদের স্বাগত জানিয়ে বানানো তোরণের রঙিন কাগজের বাহারি রঙ নেই...। হঠাৎ বেতারে ভেসে আসে একটি কর্কশ কণ্ঠ...।

সোভিয়েত পায়রা, কোকাব শহরের পায়রা, কিউবার পায়রা, আজমীর শরীফের পায়রা... সব পায়রারা রাজার জন্য, ছোট্ট রাজকুমারের জন্য শোকে বেদনায় বাকবাকুম ভুলে মৌনতায় নিঝুম হয়ে যায় আর রাজবাড়ির আকাশ জুড়ে নি:শব্দে উড়তে থাকে শ্রাবণ দিনের কান্নায়। তোমরা এখনো যদি কেউ সেই বাড়িটির কাছে যাও, আকাশপানে পবিত্র চোখে তাকাও, দেখতে পাবে ওরা উড়ছে শান্তির ডানা মেলে...। আর মৌনতায় গাইছে– শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ...

মুজিব মানে আকাশ

আমীরুল ইসলাম

মুজিব মানে আকাশ নদী
মুজিব মানে ফুলের বন।
মুজিব মানে ছয়টি দফা
একাত্তরের নির্বাচন।

মুজিব মানে মৃত্যুঞ্জয়
হোক না জুলুম-আপোশহীন
মুজিব মানে জাতির পিতা
নতুন সূর্য নতুন দিন।

মুজিব মানে অজর অমর
বীর বাঙালির স্বপ্ন আশা
মুজিব মানে জাতির পিতা
শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা।

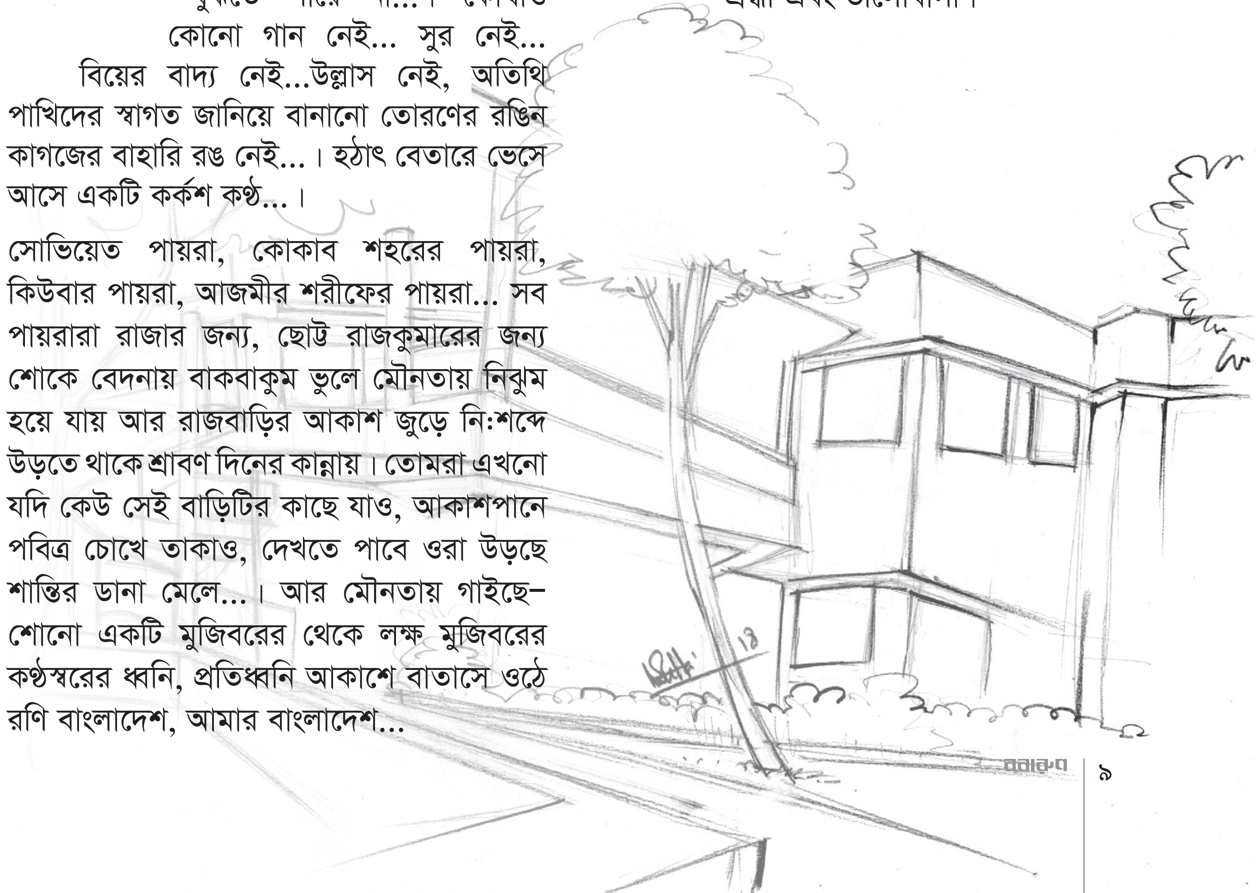

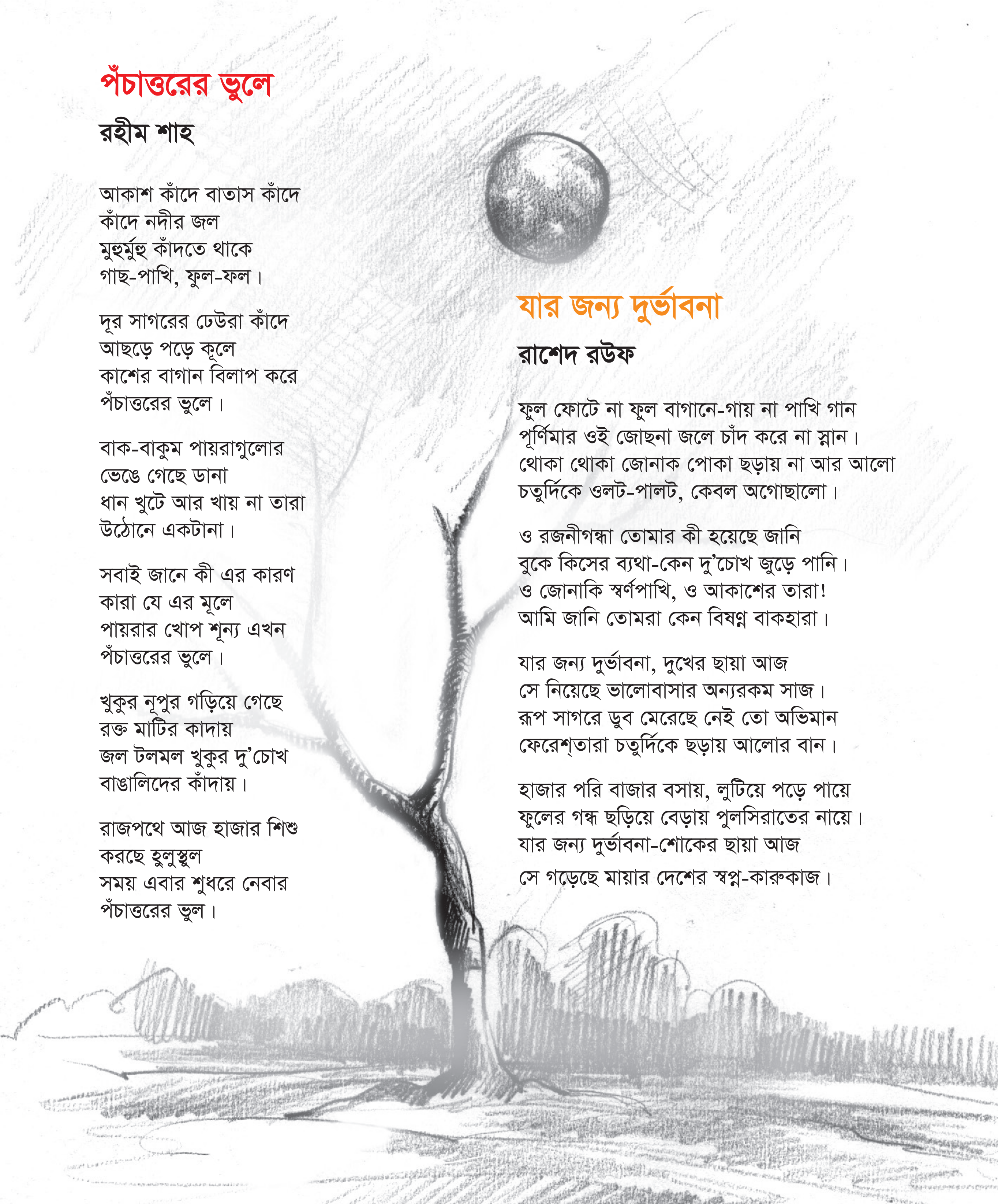

পঁচাত্তরের ভুলে

রহীম শাহ

আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে
কাঁদে নদীর জল
মুহুর্মুহু কাঁদতে থাকে
গাছ-পাখি, ফুল-ফল।

দূর সাগরের ঢেউরা কাঁদে
আছড়ে পড়ে কূলে
কাশের বাগান বিলাপ করে
পঁচাত্তরের ভুলে।

বাক-বাকুম পায়রাগুলোর
ভেঙে গেছে ডানা
ধান খুটে আর খায় না তারা
উঠোনে একটানা।

সবাই জানে কী এর কারণ
কারা যে এর মূলে
পায়রার খোপ শূন্য এখন
পঁচাত্তরের ভুলে।

খুকুর নূপুর গড়িয়ে গেছে
রক্ত মাটির কাদায়
জল টলমল খুকুর দু'চোখ
বাঙালিদের কাঁদায়।

রাজপথে আজ হাজার শিশু
করছে হুলুস্থুল
সময় এবার শুধরে নেবার
পঁচাত্তরের ভুল।

যার জন্য দুর্ভাবনা

রাশেদ রউফ

ফুল ফোটে না ফুল বাগানে-গায় না পাখি গান
পূর্ণিমার ওই জোছনা জলে চাঁদ করে না স্নান।
থোকা থোকা জোনাক পোকা ছড়ায় না আর আলো
চতুর্দিকে ওলট-পালট, কেবল অগোছালো।

ও রজনীগন্ধা তোমার কী হয়েছে জানি
বুকে কিসের ব্যথা-কেন দু'চোখ জুড়ে পানি।
ও জোনাকি স্বর্ণপাখি, ও আকাশের তারা!
আমি জানি তোমরা কেন বিষণ্ন বাকহারা।

যার জন্য দুর্ভাবনা, দুখের ছায়া আজ
সে নিয়েছে ভালোবাসার অন্যরকম সাজ।
রূপ সাগরে ডুব মেরেছে নেই তো অভিমান
ফেরেশ্‌তারা চতুর্দিকে ছড়ায় আলোর বান।

হাজার পরি বাজার বসায়, লুটিয়ে পড়ে পায়ে
ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে বেড়ায় পুলসিরাতের নায়ে।
যার জন্য দুর্ভাবনা-শোকের ছায়া আজ
সে গড়েছে মায়ার দেশের স্বপ্ন-কারুকাজ।

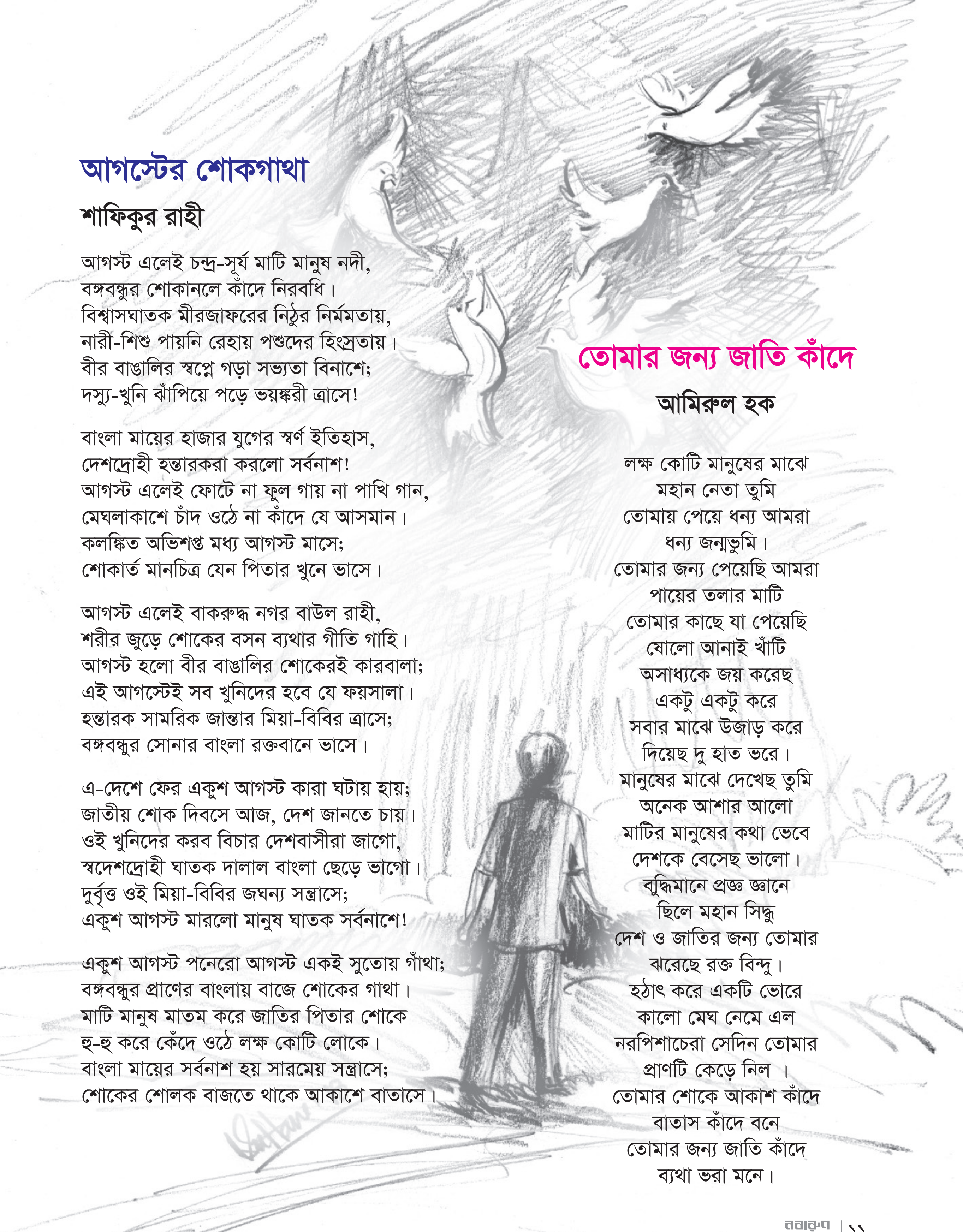

আগস্টের শোকগাথা

শাফিকুর রাহী

আগস্ট এলেই চন্দ্র-সূর্য মাটি মানুষ নদী,
বঙ্গবন্ধুর শোকানলে কাঁদে নিরবধি।
বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নিঠুর নির্মমতায়,
নারী-শিশু পায়নি রেহায় পশুদের হিংস্রতায়।
বীর বাঙালির স্বপ্নে গড়া সভ্যতা বিনাশে;
দস্যু-খুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ভয়ঙ্করী ত্রাসে!

বাংলা মায়ের হাজার যুগের স্বর্ণ ইতিহাস,
দেশদ্রোহী হন্তারকরা করলো সর্বনাশ!
আগস্ট এলেই ফোটে না ফুল গায় না পাখি গান,
মেঘলাকাশে চাঁদ ওঠে না কাঁদে যে আসমান।
কলঙ্কিত অভিশপ্ত মধ্য আগস্ট মাসে;
শোকার্ত মানচিত্র যেন পিতার খুনে ভাসে।

আগস্ট এলেই বাকরুদ্ধ নগর বাউল রাহী,
শরীর জুড়ে শোকের বসন ব্যথার গীতি গাহি।
আগস্ট হলো বীর বাঙালির শোকেরই কারবালা;
এই আগস্টেই সব খুনিদের হবে যে ফয়সালা।
হন্তারক সামরিক জান্তার মিয়া-বিবির ত্রাসে;
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা রক্তবানে ভাসে।

এ-দেশে ফের একুশ আগস্ট কারা ঘটায় হায়;
জাতীয় শোক দিবসে আজ, দেশ জানতে চায়।
ওই খুনিদের করব বিচার দেশবাসীরা জাগো,
স্বদেশদ্রোহী ঘাতক দালাল বাংলা ছেড়ে ভাগো।
দুর্বৃত্ত ওই মিয়া-বিবির জঘন্য সন্ত্রাসে;
একুশ আগস্ট মারলো মানুষ ঘাতক সর্বনাশে!

একুশ আগস্ট পনেরো আগস্ট একই সুতোয় গাঁথা;
বঙ্গবন্ধুর প্রাণের বাংলায় বাজে শোকের গাথা।
মাটি মানুষ মাতম করে জাতির পিতার শোকে
হু-হু করে কেঁদে ওঠে লক্ষ কোটি লোকে।
বাংলা মায়ের সর্বনাশ হয় সারমেয় সন্ত্রাসে;
শোকের শোলক বাজতে থাকে আকাশে বাতাসে।

তোমার জন্য জাতি কাঁদে

আমিরুল হক

লক্ষ কোটি মানুষের মাঝে
মহান নেতা তুমি
তোমায় পেয়ে ধন্য আমরা
ধন্য জন্মভুমি।
তোমার জন্য পেয়েছি আমরা
পায়ের তলার মাটি
তোমার কাছে যা পেয়েছি
ষোলো আনাই খাঁটি
অসাধ্যকে জয় করেছ
একটু একটু করে
সবার মাঝে উজাড় করে
দিয়েছ দু হাত ভরে।
মানুষের মাঝে দেখেছ তুমি
অনেক আশার আলো
মাটির মানুষের কথা ভেবে
দেশকে বেসেছ ভালো।
বুদ্ধিমানে প্রজ্ঞ জ্ঞানে
ছিলে মহান সিন্ধু
দেশ ও জাতির জন্য তোমার
ঝরেছে রক্ত বিন্দু।
হঠাৎ করে একটি ভোরে
কালো মেঘ নেমে এল
নরপিশাচেরা সেদিন তোমার
প্রাণটি কেড়ে নিল ।
তোমার শোকে আকাশ কাঁদে
বাতাস কাঁদে বনে
তোমার জন্য জাতি কাঁদে
ব্যথা ভরা মনে।

খোকা থেকে জাতির পিতা

ইব্রাহিম নোমান

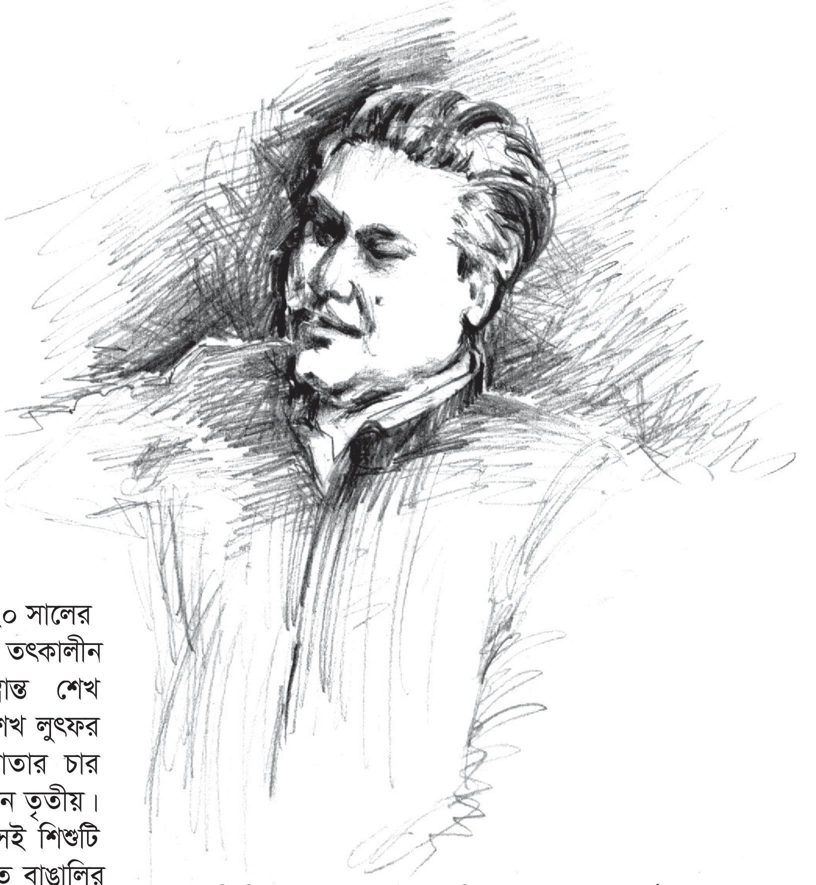

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এমন এক নেতা যিনি বাঙালিকে দিয়েছেন একটি দেশ, পতাকা, মানচিত্র, একটি সংগীত। তাই বাঙালির হৃদয়ে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান। যতই দিন যাচ্ছে বাঙালির কাছে বঙ্গবন্ধুর অপরিহার্যতা বাড়ছে। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ার সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মা সায়ারা খাতুন। পিতা-মাতার চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয়। সবার আদরের খোকা। খোকা নামের সেই শিশুটি পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালির ত্রাতা ও মুক্তির দিশারি। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আত্মত্যাগ এবং জনগণের প্রতি মমত্ববোধের কারণে হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা।

গ্রামের স্কুলে লেখাপড়ার হাতেখড়ি তাঁর। ১৯২৭ সালে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। নয় বছর বয়সে ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিশোর বয়সেই বঙ্গবন্ধু সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে কারাবরণ করেন। এরপর থেকেই তাঁর বিপ্লবী জীবন শুরু। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে মাওলানা আজাদ কলেজ) ভর্তি হন। এখানেই সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের বছর তিনি বিএ পাস করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। যার মাধ্যমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। পরে ’৬৬র ছয় দফা আন্দোলন, ’৬৯র গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে ’৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বীর বাঙালি ’৭১র ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে নেয়। জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম

বাংলাদেশের। শেখ মুজিব হন বাঙালির জাতির পিতা। '৭৫র ১৫ই আগস্ট কালরাতে ঘাতকদের বুলেটে সপরিবারে নিহত হন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খোকা থেকে মুজিব এবং বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে উঠার পথ মসৃণ ছিল না। এই জন্য ইতিহাসের দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। জেল-জুলুম আর নির্যাতনের সিঁড়ি বেয়ে এগোতে হয়েছে তাঁকে।

তিনি বড়ো হয়েছিলেন স্বীয় প্রতিভায়, তেজে, সাহসে, ভালোবাসা, সবলতায় এবং অঙ্গীকারে। সমাজের দুর্বল মানুষের প্রতি শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মুজিবের কৈশোরের সেই অঙ্গীকারের প্রতি বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ন ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

সোনার চামচ নিয়ে জন্মাননি তিনি। আর রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেও শ্রেণি অবস্থান বদল হয়নি তাঁর। পরিবর্তন ছিল না চলন-বলন ও কথনের মধ্যে। নিজের নতুন লুঙ্গি অন্যকে দান করা এবং নিজেদের গোলার ধান ক্ষুধার্তদের বিলিয়ে দেওয়া কিশোর ৭ম শ্রেণির ছাত্র সাহসী মুজিবকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অভিযোগে কারাগারে যেতে হয়েছিল। পেরেছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ও মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সামনে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক ছাত্রদের দাবি আদায় করতে।

১৯৪৭ সালে গঠিত হলো গণতান্ত্রিক যুবলীগ। ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ। ১৯৪৯ সালের ২৪শে জুন শেখ মুজিব জেলে বসেই নির্বাচিত হলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে পিকেটিংরত অবস্থায় প্রথম বন্দি হন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন সমর্থনের কারণে ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হন শেখ মুজিব। মুচলেকা দেননি তাই ছাত্র জীবনের ইতি ঘটে সেখানে।

শুরু হলো জীবনের আরেক অধ্যায়। বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবিতে আন্দোলন। আবার বন্দি দীর্ঘদিন ধরে। ১৯৫০ সাল থেকে দীর্ঘদিন বন্দি ছিলেন তিনি। ছাড়া পান ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি। যাদের রক্তের বিনিময়ে মুক্তি পেলেন তাদের ত্যাগ মুজিবকে আরো বেশি সাহসী ও গতিশীল করে তোলে। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আইয়ুবের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যও নেতা কেবল মুজিব। তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের চাইতে একধাপ এগিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য ঐতিহাসিক ছয় দফার দাবি পেশ করেন। আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করলেন। বন্দি রাখলেন দীর্ঘদিন মুজিব এবং তার প্রায় সব অনুসারীদের। পাঁয়তারা করলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি দেওয়ার। জনগণ মাঠে নামল। শেষে জনতার শক্তির কাছে অস্ত্রের পরাজয়। মুজিব মুক্তি পেলেন। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পল্টনে শেখ মুজিবকে দেওয়া হলো 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি। আর ক্ষমতা ছাড়তে হলো আইয়ুবকে।

এরপর তিনি আর মুজিব নন, বঙ্গবন্ধু। কৃতজ্ঞতার এ ঋণ শোধ করার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শেখ মুজিব আইয়ুবের উত্তরাধিকারী ইয়াহিয়ার কাছ

> **১৯২০ থেকে ১৯৭৫ সাল। মাত্র ৫৫ বছরের সংগ্রামী জীবন তাঁর। রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এক রাজনৈতিক সংগ্রামবহুল জীবনের অধিকারী এই নেতা বিশ্ব ইতিহাসে ঠাঁই করে নেন স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে।**

> 'ভিক্ষুক জাতির নেতৃত্ব করতে আমি চাই না। আমি চাই আমার দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক এবং সেই জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।'
>
> **জাতির পিতা**
> **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**
> ২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫

থেকে প্রথমেই দুটি জিনিস আদায় করে নিলেন। প্যারেটির (পূর্ব ও পশ্চিমের সমান প্রতিনিধি) পরিবর্তে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং জনগণের ভোটে নেতা নির্ধারণ। কৌশলে মুজিব জয়ী হলেন। সত্তরের নির্বাচনে জনগণ পাকিস্তানের ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ১৬৯ এর মধ্যে ১৬৭টিতে মুজিবের দল আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে। এই বিজয় শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, সমগ্র পাকিস্তান শাসনের অধিকার পান তিনি। পাকিস্তানিরা 'বাঙালি নেটিভ' দ্বারা শাসিত হওয়া মেনে নেয়নি। সাহসী মুজিব গভীর বিচক্ষণতার সাথে দুর্বল অবস্থানে দাঁড়িয়ে বৃহৎশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল বের করেন। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ঘোষণা করলেন পাক সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ। ৭ই মার্চ শত্রুর কামান ও বন্দুককে উপেক্ষা করে দশ লাখ লোকের উপস্থিতিতে সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার স্পষ্ট ঘোষণা দেন। বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি নির্দেশ প্রদান করেন 'আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর (পাক সেনাবাহিনী) মোকাবেলা করার।'

গান্ধীর অসহযোগ সফল হয়নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন একটি নজিরবিহীন ঘটনা। এমনকি বাস্তিল কারাগারের পতন, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, মাও সেতুং-এর লং মার্চ– এসব ঘটনার চাইতেও ব্যতিক্রম কৌশল ছিল এই আন্দোলন। কার্যত ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ পাক প্রেসিডেন্ট ঢাকায় আসতে মুজিবের অনুমতি নিতে হয়েছিল। আর তার উপস্থিতিতে এতদাঞ্চলে চলছিল মুজিবের প্যারালাল সরকার।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে শত্রুরা যখন মুজিবকে বন্দি করে, তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে–'This may be my last message from today, Bangladesh is Indenpendent'. আর মুজিব সৈনিকরা তখন মুক্তাঞ্চলে, প্রতিরোধে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ১০ই এপ্রিল '৭১ তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখরা গঠন করেন মুজিবনগর সরকার। তৈরি হয় ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। মুজিবনগর সরকারের বিচক্ষণতায় ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পাকবাহিনীর ৯৩ হাজার সৈনিক রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দেশ পাকহানাদার মুক্ত হয়। মুক্ত স্বদেশে ফিরে মুজিব মাত্র ৩ মাসের মধ্যে মিত্র বাহিনীকে ফেরত পাঠানো, বিদেশি সৈন্য অবস্থানকালেও বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশসমূহের স্বীকৃতি আদায়, দশ মাসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধান প্রণয়ন, বিদেশি প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই মাত্র ৩ বছরে সীমাহীন আর্থিক সংকট, বার্ষিক সাহায্য ঋণ অনুদান মাত্র ৫০ কোটি ডলার দিয়ে কোটি লোকের পুর্নবাসন, আইন, শৃঙ্খলা, প্রশাসন, উৎপাদন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে আনতে সক্ষম হন। রাষ্ট্র পরিচালনায় এসে বঙ্গবন্ধু দেখলেন কলোনিয়াল বুল দিয়ে রাজার মতো দেশ শাসন করা যায়, কিন্তু দুঃখী মানুষের কল্যাণ আসে না। তাই তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লব শুরু হয় বিশ্বের শোষিত মানুষের পক্ষে। কিন্তু আন্তর্জাতিক এবং স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এর নেতৃত্বে কারা ছিল, সে ইতিহাস আজ জাতির কাছে অজানা নয়।

১৯২০ থেকে ১৯৭৫ সাল। মাত্র ৫৫ বছরের সংগ্রামী জীবন তাঁর। রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এক রাজনৈতিক সংগ্রামবহুল জীবনের অধিকারী এই নেতা বিশ্ব ইতিহাসে ঠাঁই করে নেন স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে।

বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যত। আগামীতে দেশগড়ার নেতৃত্ব তাদের হাতেই। শিশুরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মর্যাদা ও মহিমায় সমৃদ্ধ হোক -এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত চাওয়া। বঙ্গবন্ধুর জীবনও শিশুদের জন্য এক শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্য আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি এবং স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে ।

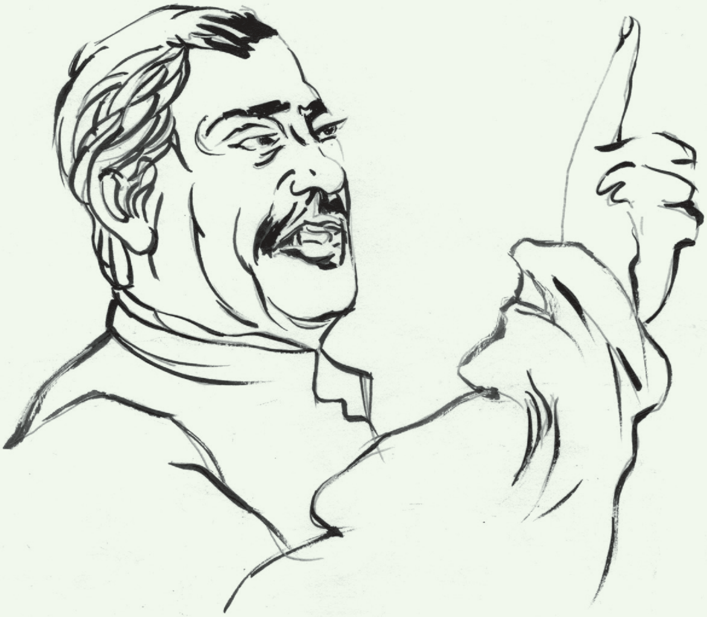

হাসে না মুজিব ভক্ত

আলম তালুকদার

এই মাসে রোদ হাসে না
পাখি হাসে না আঁখি হাসে না
হাসে না মুজিব ভক্ত
গোলাপে দেখি রক্ত!

এই মাসে বাতাস হাসে না
সূর্য হাসে না জোছনা হাসে না
হাসে না মুজিব ভক্ত
রোদেও দেখি রক্ত!

এই মাসে বৃষ্টি হাসে না
সৃষ্টি হাসে না কৃষ্টি হাসে না
হাসে না মুজিব ভক্ত
মাটিতে মুজিব রক্ত!

এই মাসে শিশু হাসে না
মায়ে হাসে না বাপে হাসে না
হাসে না মুজিব ভক্ত
হৃদয়ে দেখি রক্ত!

আজ বাঙালির মন ভালো নেই

লুৎফর রহমান সরদার

চোখ টলোমলো মুখটি বেজার
সব বাঙালির শোক হাহাকার
লালচে রঙের গোলাপ জবার
আজকে মলিন কালো আঁধার।

আকাশ ভরা মেঘের ছড়া
বৃষ্টি হয়ে মুষড়ে পড়া
জাতির কী আজ অসুখ হলো?
কী হলো গো একটু বলো!

আজ বাঙালির মন ভালো নেই
বাংলাদেশের মূল আলো নেই
শোক অফুরান দুঃখ জাগে
পনেরো আগস্ট আবার এলেই।

মুজিব ছাড়া

এমরান চৌধুরী

শুকিয়ে গেছে চোখের পানি
কষ্টে পোড়া মন
কোথায় গেলি খোকারে তুই
কোথায় তুই এখন?

মান করেছিস মায়ের উপর
তোর অপেক্ষায় -মা
চার দশকেরও বেশি সময়
রাঁধন রাঁধে না।

সকাল সাঁঝে বিছিয়ে রাখে
পথের পরে চোখ
এই তো ফিরে আসল খোকা
কাটল বুঝি শোক।

কিন্তু নারে! কেউ আসে না
শূন্য মেঠোপথ
কেউ জানে না কে পুরাবে
মায়ের মনোরথ?

দেশ দিয়েছিস মিষ্টি নামের
আর পতাকা-গান
পঁচাত্তরে স্বজনসহ
দিলে নিজের প্রাণ।

এমন করে ক'জন পারে
বিলিয়ে দিতে হায়!
মুজিব ছাড়া বাংলাদেশে
এমন তো কেউ নাই।

ঘুরে এলাম টুঙ্গিপাড়া

শেকসপীয়ার কায়সার

১৫ই আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস। এই দিনে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে একদল ঘাতক। শুধু আমাদের জাতির পিতাকে নয়, হত্যা করে তাঁর ছোটো ছেলে শেখ রাসেলসহ পরিবারের সবাইকে। প্রতি বছর আগস্ট মাস এলেই টিভিতে নানা আলোচনা শুনে আমার খুব ইচ্ছে হলো টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি দেখার। ১৪ই মে ২০১৭ তারিখে আম্মুর সাথে টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রাতের গাড়িতে ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে রওয়ানা হয়ে প্রায় রাত ১২টায় আমরা পদ্মার পাড়ে পৌঁছলাম। সারা রাত ঝড়বৃষ্টিতে নদীর ঘাটে বসেই রইলাম গাড়িতে। ঝড়ের তীব্র গতিতে মনে হচ্ছিল এই বুঝি বাসটা উড়ে গিয়ে নদীতে পড়বে। আম্মু ভয়ে দোয়া পড়তে লাগলেন।

সকাল প্রায় ৭টায় ফেরিতে নদী পার হয়ে ওপাড়ে পৌঁছলাম। সকাল ১০টার দিকে আমরা টুঙ্গিপাড়া পৌঁছলাম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে দাঁড়িয়ে আম্মু আর আমি দোয়া পড়লাম। সাদা পাথরে বাঁধানো সমাধি, কী নীরবতা। কী যে কষ্ট লাগে সেখানে দাঁড়ালে, তা বুঝাতে পারি না। আমার মনে অনেক কষ্ট লাগছিল যখন আমরা বেরিয়ে আসি। আমার আরো থাকতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু আম্মুর কাজ ছিল তাই আর বেশি সময় থাকা হয়নি। আমরা টুঙ্গিপাড়া থেকে গেলাম গোপালগঞ্জ শহরে। তারপর গেলাম নানা বাড়ি মুকসুদপুরে। রাতে নানু বাড়ি থেকে পরের দিন সকালে আমরা আবার ঢাকায় ফিরে এলাম। আর চোখের সামনে সারাক্ষণ ভেসে ছিল বঙ্গবন্ধুর সমাধি।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

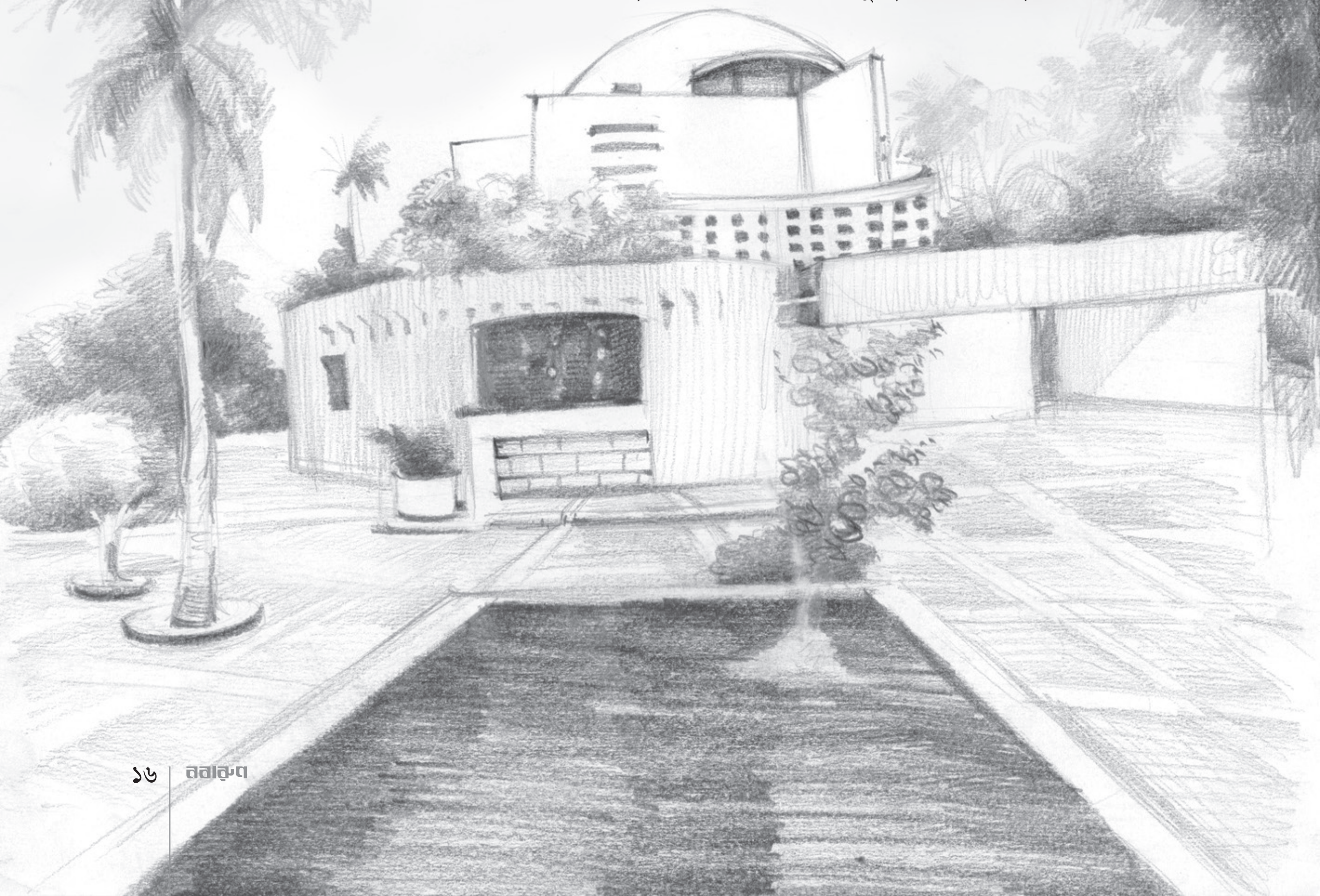

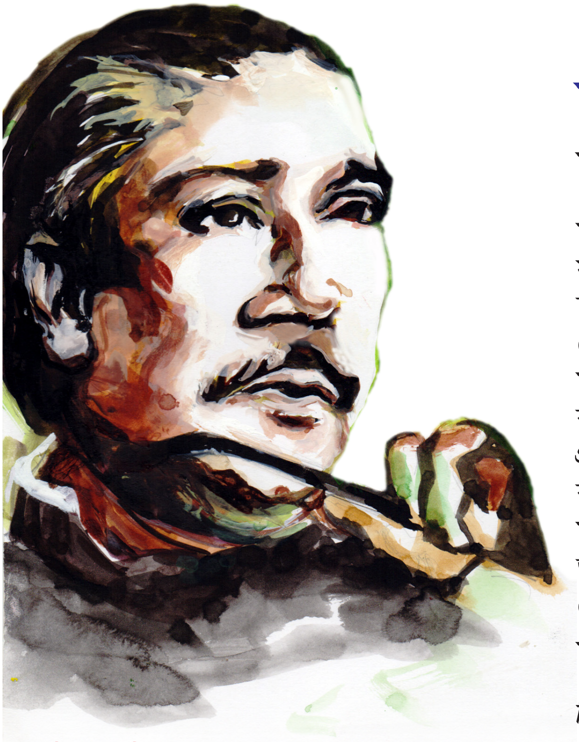

জাতির পিতা

সোহরাব পাশা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
জাতির মহান নেতা
তাঁর ইশারায় একাত্তরে
মুক্তিযুদ্ধে জেতা,

সাতই মার্চের ভাষণটি তাঁর
বাঁধ ভাঙা এক নদী
বজ্রকণ্ঠে উঠল কেঁপে
পাকিস্তানের গদি;

পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট
ভয়াল কালরাতে
ঘাতকচক্র হানলো ছোবল
বিশ্ব অবাক তাতে,

ভুলব না তাঁর স্বপ্ন মধুর
সোনার বাংলা গড়বই
শত্রু এলে জোট বেঁধে সব
বীর বাঙালি লড়বই।

মহান নেতা

মুহম্মদ আহনাফ সিদ্দিক

মহান নেতার ডাক শুনলে
সবাই ছুটে আসে,
চাষা ভাই চাষ করছে
নৌকাগুলো ভাসে।
মহান নেতা বলল এবার
করো সবাই যুদ্ধ,
গ্রামে এসে পাকিস্তানি
করছে অবরুদ্ধ
মহান নেতা বঙ্গবন্ধু
ডাকে সবাই তাকে,
দোয়েল শ্যামা ময়না পাখি
মহান নেতা ডাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণি, গলাচিপা মডেল সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী।

মুজিব নামে চিনি

আলমগীর কবির

আমি তাঁকে পাখি বলি
স্বাধীনতার পাখি,
যে পাখিটার বুকে ছিল
আলোর মাখামাখি।

সবার আগে মাতৃভূমি
তারপরে সব অন্য,
সারাজীবন লড়ে গেলেন
স্বাধীনতার জন্য।

তাঁর অবদান তারার মতো
জ্বলবে চিরদিনই,
স্বাধীনতার সেই পাখিকে
মুজিব নামে চিনি।

বঙ্গবন্ধুকে আমি কাছ থেকে দেখেছি

মীর জামাল উদ্দিন

বঙ্গবন্ধুকে আমি কাছ থেকে দেখেছি তিনবার। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের সময় দুবার। আর স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনি কাজে সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন। নির্বাচনি জনসভায় বাঙালির স্বাধিকারের কথাটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরছেন। যেখানেই জনসভা সেখানেই হাজার হাজার মানুষ। জনসভায় তিল ধারনের ঠাঁই থাকে না। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তৃতা শোনে উজ্জীবিত হয় এবং স্বাধিকারের পক্ষে ভোট দিতে প্রস্তুত হয়।

প্রথম বঙ্গবন্ধুকে দেখি ময়নামতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। ১৯৭০ সাল। নির্বাচনি জনসভা। কুমিল্লা সিলেট মহাসড়কের ছয় সাত হাত উঁচুতে প্রাইমারি স্কুল মাঠ। মাঠটি বিশাল, প্রায় বর্গাকৃতি। মাঠের পূর্বদিকে বেশ উঁচু টিলার সমতলে ময়নামতি উচ্চ বিদ্যালয়। টিলার গায়ে বেশ বড়ো দুটি হরিতকি গাছ। ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি আম কাঁঠালের গাছও আছে। মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিন-চারটি আম কাঁঠাল গাছ। ময়নামতি হাই স্কুলের দক্ষিণ পাশে হাই স্কুল মাঠ। তার লাগোয়া উঁচু টিলা সমতলে বটবৃক্ষের ছায়ে ময়নামতি শাহী ঈদগাহ মাঠ।

সে সময় দু'দুটি প্রলয়ংকরী ঝড় ঘটে যাচ্ছিল। একটি রাজনৈতিক আর একটি প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক ঝড়ে সারাদেশ কমবেশি তছনছ। বিশেষ করে উপকূল অঞ্চল খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস দুটোই একসাথে আঘাত হেনেছে। গবাদি পশু, রবি ফসল, ঘরবাড়ি তো ভেঙে পড়েছে তলিয়েও গেছে বহু। মানুষজনের হতাহতের পরিমাণ বর্ণনাতীত। এরই মাঝে বঙ্গবন্ধু সারাদেশ ঘুরে ঘুরে নির্বাচনি সভার পাশাপাশি মানুষজনের দুঃখ-কষ্টের খোঁজখবর রাখছেন।

আবুল বাশার চেয়ারম্যান ময়নামতি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা। ময়নামতি সাহেব বাজার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিস। বঙ্গবন্ধু আসবেন, বক্তৃতা দিবেন, দু'তিন দিন ধরে তাই চার পাঁচ মাইল ব্যাপী চতুর্দিকে চারটি রিক্সা করে মাইকিং হলো। মাঠের উত্তরে মঞ্চ, দক্ষিণে খোলা মাঠ। সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো। বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উঠার আগেই জনমানুষে মাঠ কানায় কানায় ভরে গেল। এই প্রথম দেখলাম, মানুষ গাছে চড়েও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে।

পবিত্র কোরান তেলাওয়াত-এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু। ঘোষণা এল, এখন পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করবেন কারি মোহাম্মদ হানিফ মীর। আমার বাবা। ময়নামতি জামে মসজিদের ইমাম। মাইকে কোরান তেলাওয়াত শেষে দোয়া পরিচালনা করে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বঙ্গবন্ধু পেছন থেকে

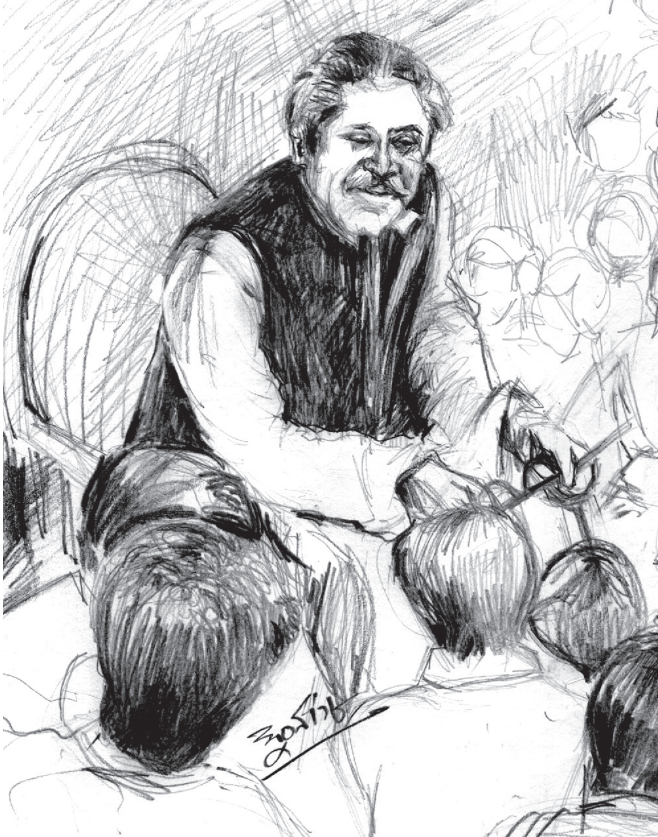

ডেকে বললেন, ‘কারি সাহেব, এখানে আসুন’। বাবা মোনাজাতে দেশ ও জাতির কল্যাণে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। বিশেষ করে প্রার্থনা করলেন, আল্লাহ পাক বঙ্গবন্ধুকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করেন। তিনি যেন এ জাতি ও দেশকে স্বাধীনতা এনে দিতে পারেন।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে তাঁর কাছে যেতেই পাশে একটি খালি চেয়ারে বসতে বললেন বাবাকে। আমি বাবার পিছু পিছু ছিলাম। বঙ্গবন্ধু আমাকে টেনে নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও বাবার মাঝখানে বসালেন। আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম বললাম, মীর জামাল উদ্দিন। নাম শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘বাহ! বেশ সুন্দর নাম তো। জামালুদ্দিন আফগানির নাম শুনেছ? বললাম, জি! শুনেছি। কার কাছ থেকে শুনেছ? বাবার কাছ থেকে’। তখনই মাইকে ঘোষণা এল এখন বক্তৃতা দিতে আসছেন এই বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, বাংলার দুঃখী, বঞ্চিত, অবহেলিত জনমানুষের নেতা, অধিকার আদায়ে অকুতোভয় বীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

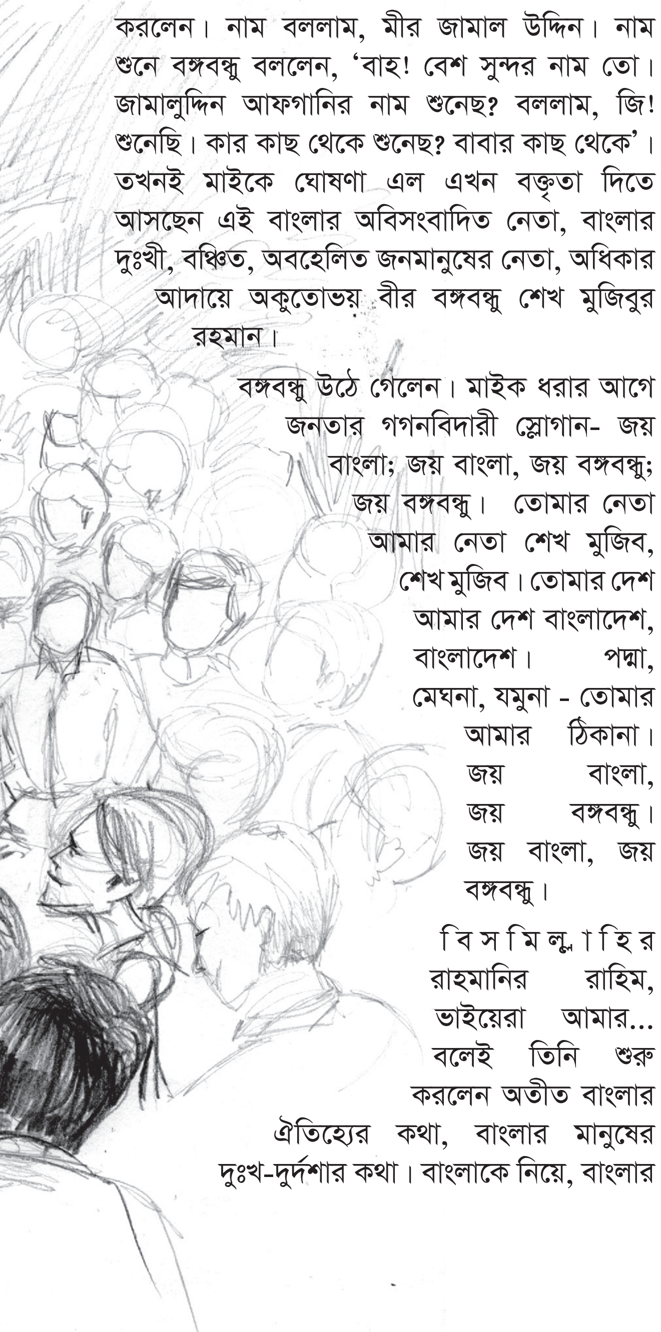

বঙ্গবন্ধু উঠে গেলেন। মাইক ধরার আগে জনতার গগনবিদারী স্লোগান- জয় বাংলা; জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু; জয় বঙ্গবন্ধু। তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা - তোমার আমার ঠিকানা। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ভাইয়েরা আমার... বলেই তিনি শুরু করলেন অতীত বাংলার ঐতিহ্যের কথা, বাংলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা। বাংলাকে নিয়ে, বাংলার মানুষের ভাগ্য নিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা, পাকিস্তান লাভের পর মাতৃভাষা নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর কুমতলবের কথা। ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার কথা, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার কথা। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেওয়ার কথা এবং বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনের কথা। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও আইয়ুব খানের বেআইনি ক্ষমতা দখল করা।

বাঙালির মুক্তি সনদ ছয়দফা জনসমক্ষে তুলে ধরা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে তাঁকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানোর চেষ্টা করার কথা। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের কথা এবং সর্বোপরি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের জন্য সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক রায় প্রদানের আহবান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। বক্তৃতার সময় মাঠে পিনপতন নীরবতা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোতে বসে, কেউ ছাদে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল। জনসভার পর লোকজন যার যার গন্তব্য পথে হেঁটে যাচ্ছিল।

বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতৃবৃন্দকে বহনকারী গাড়ি দুটি জনতার ভিড় ঠেলে ময়নামতি সেনানিবাসের পথে আসতে অনেক সময় লেগেছিল।

দ্বিতীয় দেখাটি একটু দূর থেকে দেখা। তাও নির্বাচনের আগে। কুমিল্লা টমছম ব্রিজ এয়ারপোর্ট রোডে জনসভা। মাইকে ঘোষণা শোনা মাত্রই জনসভায় যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি শুরু। সভা বিকাল তিনটায়। বাড়ি থেকে জনসভায় পৌঁছাতে সর্বোচ্চ এক ঘন্টার পথ। মনে মনে স্থির করলাম মঞ্চের কাছাকাছি থাকতে হবে। তাই সকাল ৯টায় বাড়ি থেকে বের হওয়া। সাথে আরো তিনজনকে সাথি করে নিই। রিক্সা, বেবিট্যাক্সি ও বাসপথ। তাই দুজন চারজন হলে ভালো হয়। ১১টা সোয়া এগারোটার মধ্যে সভাস্থলে পৌঁছে যাই। ইতোমধ্যে লোকজন আসতে শুরু করেছে। পাউরুটি কলা নিয়ে চার বন্ধু মঞ্চের একেবারে সামনে, যেখানে বাঁশের বেড়া সেখানে স্থান নির্দিষ্ট করে বসে পড়লাম।

সেখানেও একই দৃশ্য। মানুষ আর মানুষ। কেউ কেউ আগেভাগে গাছে চড়ে বসেছে। কেউ আগডালে, কেউ মগডালে। কেউ মগডালে চড়ে বসতেই ডাল ভেঙে পড়ছে। কেউ গাড়িতে বসে, কেউবা গাড়ির ছাদে বসে

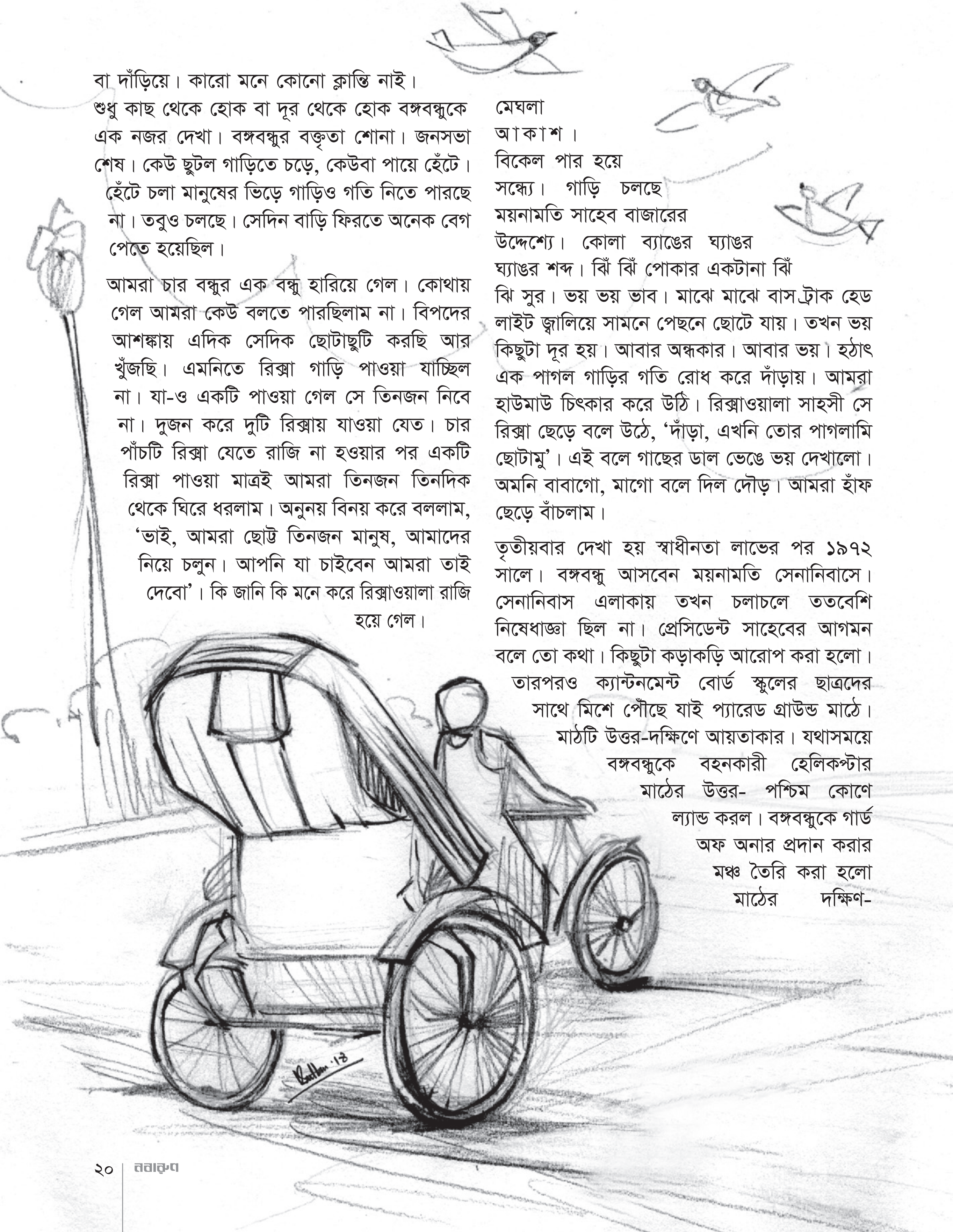

বা দাঁড়িয়ে। কারো মনে কোনো ক্লান্তি নাই। শুধু কাছ থেকে হোক বা দূর থেকে হোক বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখা। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শোনা। জনসভা শেষ। কেউ ছুটল গাড়িতে চড়ে, কেউবা পায়ে হেঁটে। হেঁটে চলা মানুষের ভিড়ে গাড়িও গতি নিতে পারছে না। তবুও চলছে। সেদিন বাড়ি ফিরতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল।

আমরা চার বন্ধুর এক বন্ধু হারিয়ে গেল। কোথায় গেল আমরা কেউ বলতে পারছিলাম না। বিপদের আশঙ্কায় এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছি আর খুঁজছি। এমনিতে রিক্সা গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না। যা-ও একটি পাওয়া গেল সে তিনজন নিবে না। দুজন করে দুটি রিক্সায় যাওয়া যেত। চার পাঁচটি রিক্সা যেতে রাজি না হওয়ার পর একটি রিক্সা পাওয়া মাত্রই আমরা তিনজন তিনদিক থেকে ঘিরে ধরলাম। অনুনয় বিনয় করে বললাম, 'ভাই, আমরা ছোট্ট তিনজন মানুষ, আমাদের নিয়ে চলুন। আপনি যা চাইবেন আমরা তাই দেবো'। কি জানি কি মনে করে রিক্সাওয়ালা রাজি হয়ে গেল।

মেঘলা আকাশ। বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যে। গাড়ি চলছে ময়নামতি সাহেব বাজারের উদ্দেশ্যে। কোলা ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর শব্দ। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ঝিঁ ঝি সুর। ভয় ভয় ভাব। মাঝে মাঝে বাস ট্রাক হেড লাইট জ্বালিয়ে সামনে পেছনে ছোটে যায়। তখন ভয় কিছুটা দূর হয়। আবার অন্ধকার। আবার ভয়। হঠাৎ এক পাগল গাড়ির গতি রোধ করে দাঁড়ায়। আমরা হাউমাউ চিৎকার করে উঠি। রিক্সাওয়ালা সাহসী সে রিক্সা ছেড়ে বলে উঠে, 'দাঁড়া, এখনি তোর পাগলামি ছোটামু'। এই বলে গাছের ডাল ভেঙে ভয় দেখালো। অমনি বাবাগো, মাগো বলে দিল দৌড়। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তৃতীয়বার দেখা হয় স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে। বঙ্গবন্ধু আসবেন ময়নামতি সেনানিবাসে। সেনানিবাস এলাকায় তখন চলাচলে ততবেশি নিষেধাজ্ঞা ছিল না। প্রেসিডেন্ট সাহেবের আগমন বলে তো কথা। কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করা হলো। তারপরও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের ছাত্রদের সাথে মিশে পৌঁছে যাই প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে। মাঠটি উত্তর-দক্ষিণে আয়তাকার। যথাসময়ে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী হেলিকপ্টার মাঠের উত্তর- পশ্চিম কোণে ল্যান্ড করল। বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অফ অনার প্রদান করার মঞ্চ তৈরি করা হলো মাঠের দক্ষিণ-

পশ্চিম কোণায়। বঙ্গবন্ধু স্যালুট গ্রহণ করলেন এবং ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের সাথেও কুশল বিনিময় করলেন।

মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব পাশ ঘেঁষে ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়ে। বঙ্গবন্ধু এক এক কদম ফেলে পশ্চিম থেকে পূর্ব এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসছেন। আমি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম, 'বঙ্গবন্ধু আমার সামনে আসা মাত্র তাঁকে ক্যাডেট সিস্টেমে সালাম জানাব। হাতে হাত মিলানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দিব এবং তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে একটি বাক্য উচ্চারণ করব'। যথা চিন্তা তথা কাজ। বঙ্গবন্ধু আমার সামনে আসা মাত্রই 'স্যালুট আপ' বলে হাত উঠায়ে সালাম জানালাম। হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়ালাম এবং বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করলাম, 'বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন'। বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার দিকে তাকালেন, হাতে হাত রাখলেন এবং উচ্চারণ করলেন, 'তোমরা ভালোভাবে লেখাপড়া কর। যাতে বাংলার প্রতিটি সন্তানই বঙ্গবন্ধু হতে পারে'।

সেদিন সে কিশোর বয়সে বুঝতে পেরেছিলাম বঙ্গবন্ধু শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি সমগ্র দেশ; বিশাল প্রতিষ্ঠান। পুরো দেশটাই তাঁর হৃদয়। তিনি বাংলাদেশকে ভালোবাসতেন, তিনি বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন শিশু-কিশোরদের। পড়ালেখা করে সুনাগরিক হতে বলতেন। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে সোনার বাংলা বিনির্মাণে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে বলতেন। তিনি গর্ব করে বলতেন, 'বাঙালি মানুষ হয়েছে। বাঙালি একদিন ঠিকই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে'।

বাংলাদেশ আজ সমুদ্রের অতল তলে সাবমেরিন যুগে। মহাকাশে স্যাটেলাইট যুগে। আজ বাঙালির সর্বত্র জয় জয়কার। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে। শেখ হাসিনার সরকার, বার বার দরকার। উন্নয়নের সরকার, বার বার দরকার। জীবনের এ পড়ন্ত বেলায় শুধু এটুকুই চাওয়া – দেশের প্রতিটি মানুষ যেন দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেতে পারে। দেশের মানুষ যেন দলাদলি হানাহানি থেকে মুক্ত হয়ে সুখি জীবনযাপন করতে পারে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার মানুষের মুখে যেন সুখের হাসি চির অটুট থাকে।

বিশ্বের এক মহান নেতা

জুনায়েদ তৌহিদ

মধুমতি নদীর তীরে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে,
জন্মেছিলেন জাতির পিতা,
শেখ মুজিবুর নামে।
বঙ্গবন্ধু জাতির পিতার সহজ-সরল মন
তাইতো তাঁকে ভালোবাসে দেশের জনগণ।
কামার-কুমার জেলে-চাষা সবারই প্রিয়জন।
বাংলা মায়ের চোখের মণি, বাংলা মায়ের ধন।
বড়ো হয়ে হন যে তিনি সারা বিশ্বের নেতা।
'৭১-এ জ্বালিয়ে দিল পাকিস্তানের চিতা।
যুদ্ধ করেই জয় আসলো,
জয় বাংলার নামে।
স্বাধীন হলো দেশ আমাদের,
জাতির পিতার ঘামে।
'৭৫-এর খুনিরা সব হত্যা করল তাঁকে।
কেড়ে নিতে চেয়েছিল অক্ষয় নামটাকে।
কিন্তু এ নাম যায় কী মোছা?
এ নামতো অক্ষয়।
উচ্চকণ্ঠে বলো সবাই, বীরের দেশের মহান নেতা
শেখ মুজিবুর রহমান

৪র্থ শ্রেণি, এস এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

জাতির পিতা

মো. রাইয়ান হোসেন

লাল-সবুজ পতাকা পেতে
রয়েছে যাঁর অবদান
তিনি হলেন জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর নেতৃত্বে বীর বাঙালি
পেয়েছে স্বাধীনতা
তিনি সর্বকালের সেরা
আমাদের মহান নেতা।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

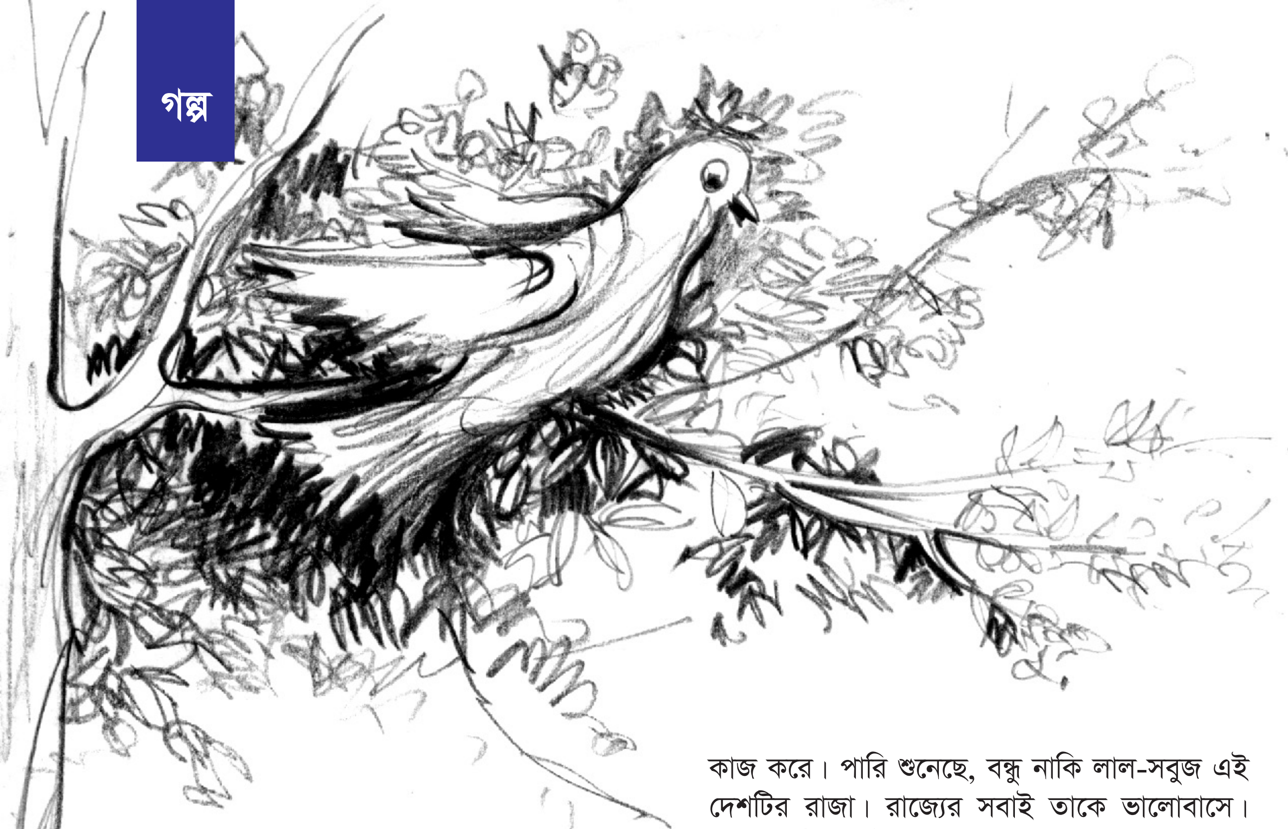

পারি ও তার বন্ধু

জ্যোৎস্নালিপি

দোতলা বাড়িটির ঠিক পেছনে একটা ঝোপের মতো আছে। ঠিক সেখানেই থাকতে ভালো লাগে পারির। সুযোগ পেলেই সে মা'র চোখের আড়ালে চলে যায় ঝোপটার কাছে। সেখানে একাকী বসে থাকে।

মা বলে, পারি যাস না ওখানে, পাশের বাড়ির হুলোটা কিন্তু ওদিক দিয়েই আনাগোনা করে। পারি চুপ থাকে আর মনে মনে বলে, দুষ্টু হুলোটা আমার কিছুই করতে পারবে না, আমার বন্ধু আছে না!

পারি জানে সে কেন ওই জায়গাটায় সুযোগ পেলেই যায়। ওই জায়গা থেকে বন্ধুকে দেখা যায়। প্রতিদিন বন্ধুকে দেখতে ভালো লাগে পারির। একদিন না দেখতে পেলে মন কেমন করে।

পারির বড়ো ভাইবোনেরা ছাদের ওপর শুকাতে দেওয়া শস্যদানা খায় আর উড়ে উড়ে মজা করে। কিন্তু পারির ভালো লাগে বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে। কিন্তু বন্ধুকে তো সব সময় পাওয়া যায় না, বন্ধু কত কাজ করে। পারি শুনেছে, বন্ধু নাকি লাল-সবুজ এই দেশটির রাজা। রাজ্যের সবাই তাকে ভালোবাসে। এই দেশটির নাকি জন্ম হয়েছে তার জন্যই।

পারি এখন অনেক ছোটো, তাই এসব কথা ভালো করে সে বোঝে না। যেদিন পারির সঙ্গে তার বন্ধুর প্রথম দেখা হয়েছিল– সেটা ছিল ওই ঝোপের কাছেই। সকালবেলা বন্ধু খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

তখন পারির নতুন পাখা গজিয়েছে। সে উড়তে গিয়ে ঝোপের একটা লতায় তার পা আটকে যায়, পারি চেষ্টা করেও উড়তে পারে না।

মা-বাবাসহ সবাই তখনও ঘর থেকে বের হয়নি। পারির ডাক কেউ শোনে না। দুষ্টু হুলোটা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসে। এই বুঝি পারিকে খেয়ে ফেলে।

পারি বাকবাকুম বাকবাকুম বলে কাঁদে; কিন্তু পারির ডাক মার কানে পৌঁছায় না। পারি ভাবে, মা-ও শুনছে না তার ডাক! তবে যে মা বলেছিল, বিপদে পড়লে মাকে ডাকলে মা ঠিক সে ডাক শুনতে পাবে, আর ছুটে এসে পারিকে উদ্ধার করবে। তাহলে মা কেন আসে না।

মা'র সঙ্গে আর বুঝি তার দেখা হলো না। মা-মা, বাবা-বাবা বলে ডুকরে কেঁদে ওঠে সে।

হুলোটা তাকে একেবারে হাতের নাগালে পেয়ে যায়। পারি চোখ বন্ধ করে। সে বুঝি হুলোটার পেটের

মধ্যে। কিন্তু কষ্ট হয় না কেন, কোনো ব্যথাও তো লাগে না। কেমন যেন বাবার আদরের অনুভব টের পায় তার পালকে।

পারি এবার ভয়ে ভয়ে চোখ খোলে। পারির চোখে বিস্ময়! এ তো দুষ্টু হুলোটা নয়, এ তো সেই, যার গল্প সে মার কাছে শুনেছে। যে সবাইকে ভালোবাসে, যার হাতে বাবার স্পর্শ, চোখে মায়ের আদর।

পারির চোখে জল আসে। সে আদর করে পারিকে বলে, ভয় পেয়ো না, দুষ্টু বিড়ালটা তোমায় মারবে না। আমি আছি না!

পারি তো সত্যি সত্যি এবার ভয় পেয়ে যায়! আরে বিড়ালটা তো কাছেই রয়েছে। পারি বলে, দেখছ না আমার শরীর কত্তো ছোটো। বিড়ালকে দেখিয়ে বলে, এক কামড়েই তো আমাকে সাবাড় করে দেবে।

তাকে আশ্বস্ত করে বলে, কিচ্ছুটি করবে না, আমায় ভরসা রাখো– বলে পারির পালকে আদর করে সে।

হুলোটিকে সে কাছে ডাকে আর বলে, দেখেছিস তোকে দেখে কত ভয় পেয়ে গেছে পায়রা ছানাটি। আমি না এলে তো তুই ওকে খেয়েই ফেলতি।

বিড়ালটি মাথা নিচু করে থাকে। তারপর বলে, এখন থেকে আর এমনটি হবে না। আমি আর কাউকে খাবো না, কামড় দেব না।

হ্যাঁ তাই, যারা দুর্বল আর ছোটো, তাদেরকে ভালোবাসতে হয়। ভরসা দিতে হয়। ছোটো বলেই কাউকে খেয়ে ফেলতে নেই বুঝলি।

হুলোটি মুখ গোমড়া করে ধীরগতিতে বলে, হুম। আর এমনটি হবে না।

পারির সঙ্গে অনেক গল্প হয় তার। পারিকে সে বলে, সবাই আমাকে বঙ্গবন্ধু বলে। তুমিও আজ থেকে আমার বন্ধু হলে। তুমি আমায় শুধু বন্ধু বলেই ডেকো। আমি সময় পেলেই তোমার সঙ্গে দেখা করব। আর আমি তোমাদের খুব ভালোবাসি।

পারি খুশি হয়। বন্ধুর পাঞ্জাবির হাতায় ঠোঁট ঘষে ভালোবাসা বিনিময় করে। পারি বলে, আচ্ছা বন্ধু তুমি এত ভালো কেন? আমায় তো তুমি চেনো না, তারপরও আমায় তুমি দুষ্টু হুলোটার হাত থেকে বাঁচালে।

বন্ধু বলে, বারে চোখের সামনে অন্যায় হলে সেটা প্রতিরোধ করতে হয়। প্রতিবাদ জানাতে হয়। এখন থেকে তুমিও সেটা করবে। আর সবাইকে ভালোবাসবে। ভালোবাসলে দুষ্টুরাও ভালো বন্ধু হয়ে যায়। হুলোটাকে দেখলে তো! কেমন ভালো হয়ে গেল– বলে হাসে সে।

পারি বলে, জানো বন্ধু, মা আমাকে তোমার গল্প আগেই বলেছে।

বন্ধু বলে, কী বলেছে তোমার মা? পারি বলে, বলেছে– তুমি সবাইকে ভালোবাসো। সবার বন্ধু। আরো আরো অনেক কথা।

বন্ধু বলে, চলো তোমাকে তোমার বাসায় দিয়ে আসি, মা আবার চিন্তা করবে।

পারি বলে, আমি পারব।

তবুও বন্ধু তাকে আর একা একা যেতে দেয় না। নিজের হাতের ওপর বসিয়ে ছাদে নিয়ে যায়। তারপর শস্যদানা খেতে দেয় নিজ হাতে। তারপর পারির বাসায় যায়। পারি আবারো তাকে ভালোবাসা জানায়। বলে, বাকবাকুম, বাকবাকুম।

বন্ধুও পারির পালকে আদর করে বিদায় নেয়। পারি তার বিদায়ি পথের পানে চেয়ে থাকে আর মনে মনে বলে, বন্ধু আমিও তোমায় খুব ভালোবাসি!

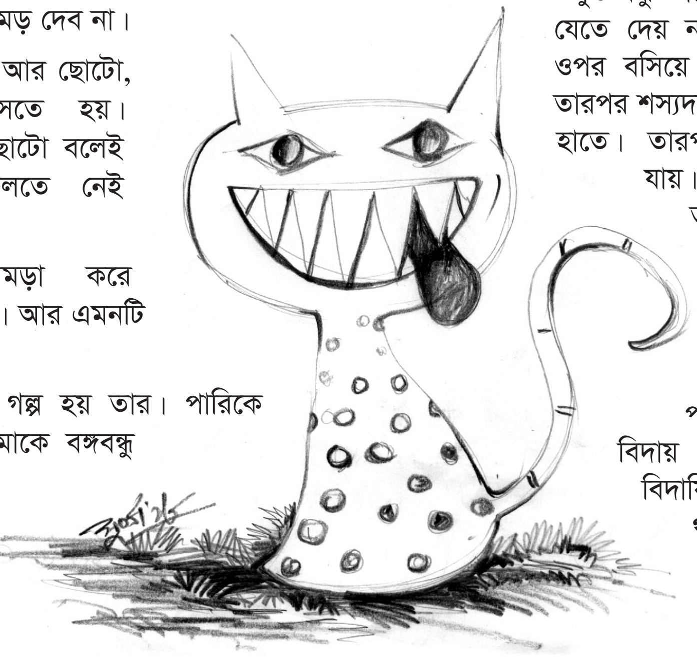

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

হামিদ আবরার

তোমারই নামে জ্বলে উঠে দ্বীপ শিখা অনির্বাণ,
তোমার সেই কান্নাঘেরা অগ্নিশিখার বেশ
মনে পড়লে দুঃখে ভাসে, কাঁদে বাংলাদেশ।
হাতে পায়ে শোষকের ছিল শেকল পরানোর খেলা
প্রতিবাদ করে রূদ্ধ হয়েছি করেছি জীবনকে হেলা।
তোমারই আদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ল লক্ষ দামাল ছেলে
ফাঁসির মঞ্চ তুচ্ছ, মৃত্যুকে ডেকেছে হেসে খেলে।
তোমার তর্জনী উদ্ধত হলেই শাসক ত্রাসে নত হয়
তোমারই পথ ধরে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা করেছি জয়।
বন্ধনে বেঁধেছ বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-হিন্দু ও মুসলমান
দেশের জন্য দিয়ে গেলে তুমি নিজ অমূল্য প্রাণ।
স্বপ্ন তুমি দেখাইছিলে হাসবে স্বদেশ মা
অন্ন বস্ত্র ঔষধের আর অভাব হবে না।
যেদিন বাংলায় সোনার সূর্য হবে অভ্যুদয়
তোমাকে স্মরে এই বাংলা জানি হবে গো ধন্যময়।
রাতটি ছিল শান্ত নীরব সব যেন ছিল থেমে
হঠাৎ যেন কাঁপল ধরণি নরক এল নেমে।
আযানের ধ্বনির সাথেই গুলির আওয়াজ আসে
হিয়া ওঠে কেঁদে বীরের প্রস্থানে
হায়েনারা হা হা হাসে।
যাবার আগে কাঁপেনি বুক তাঁর শির ছিল উন্নত
মরনের কালেও মনেতে ছিল এক দেশ এক ব্রত।
প্রস্থানেও বীর যাননি তো মরে
আজও আছেন বেঁচে বাঙালির অন্তরে।

নবম শ্রেণি
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়
শেওড়াপাড়া, ঢাকা

ছড়াগান

তৌহিদ-উল ইসলাম

চেয়ে দেখো মস্ত আকাশ
বড়োই গভীর নীল
বঙ্গবন্ধুর সাথে যে তার
কতই নিঁখুত মিল ॥

বাংলা মায়ের আঁচলখানা
সবুজ রঙে ভরা
সেই আঁচলে লেখা আছে
বঙ্গবন্ধুর ছড়া।
এই ছড়াটা পড়ছে বসে
দোয়েল শালিক চিল ॥

বাংলা মায়ের আঁচলখানা
শ্রাবণ জলে ভাসে
সেই আঁচলে বঙ্গবন্ধু
আবার ফিরে আসে।
ভোরের সাথে জেগে ওঠে
শাপলা ফোটা বিল ॥

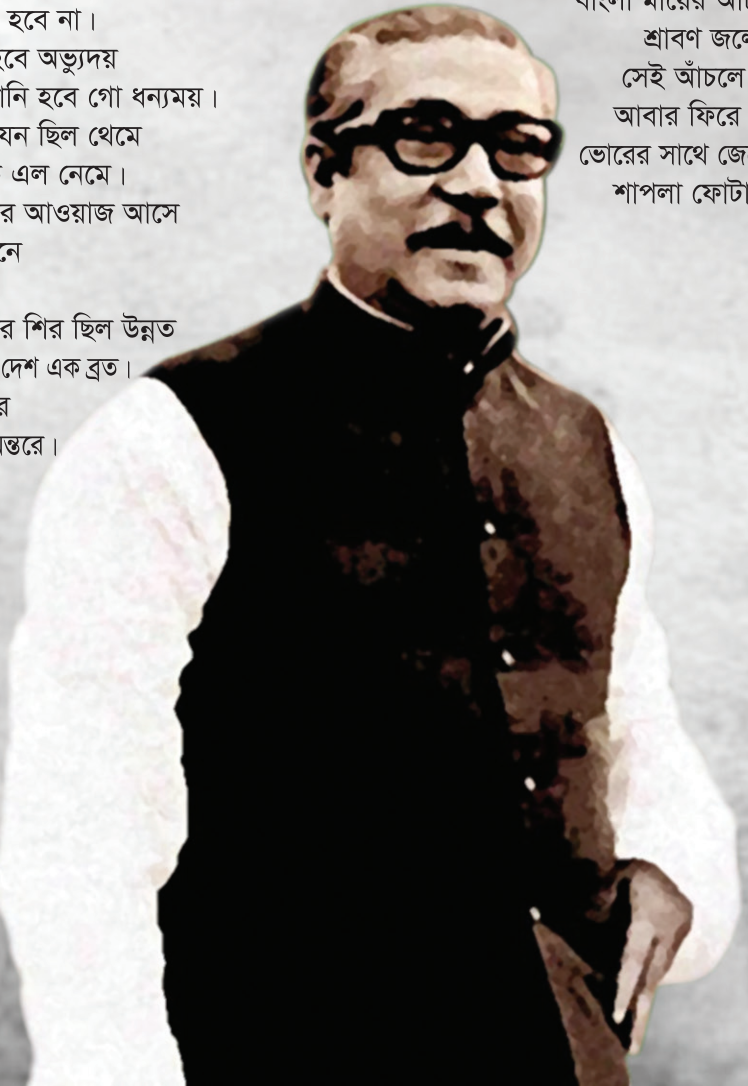

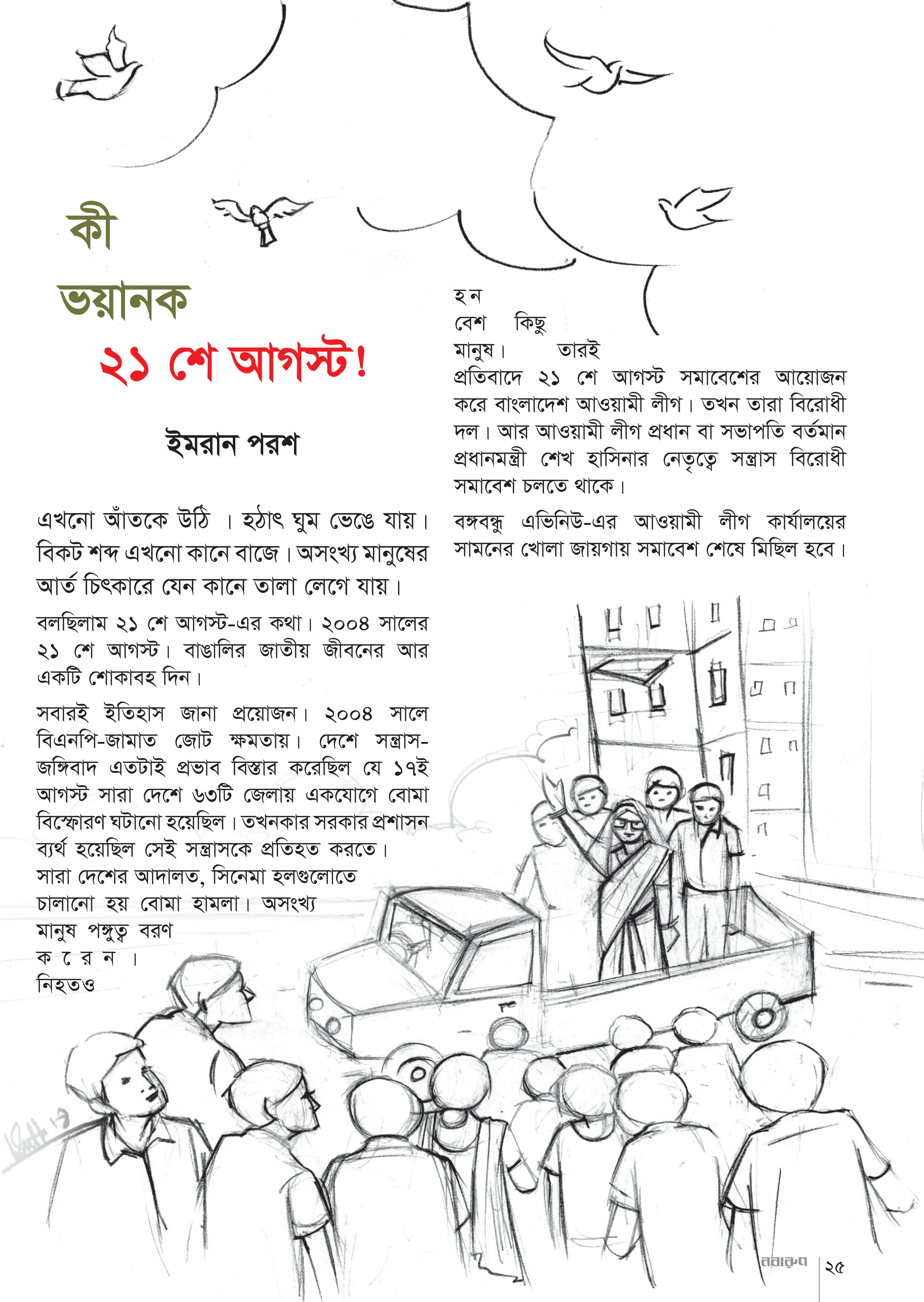

কী ভয়ানক ২১ শে আগস্ট!

ইমরান পরশ

এখনো আঁতকে উঠি । হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। বিকট শব্দ এখনো কানে বাজে। অসংখ্য মানুষের আর্ত চিৎকারে যেন কানে তালা লেগে যায়।

বলছিলাম ২১ শে আগস্ট-এর কথা। ২০০৪ সালের ২১ শে আগস্ট। বাঙালির জাতীয় জীবনের আর একটি শোকাবহ দিন।

সবারই ইতিহাস জানা প্রয়োজন। ২০০৪ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায়। দেশে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে ১৭ই আগস্ট সারা দেশে ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। তখনকার সরকার প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছিল সেই সন্ত্রাসকে প্রতিহত করতে। সারা দেশের আদালত, সিনেমা হলগুলোতে চালানো হয় বোমা হামলা। অসংখ্য মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেন। নিহতও হন বেশ কিছু মানুষ। তারই প্রতিবাদে ২১ শে আগস্ট সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। তখন তারা বিরোধী দল। আর আওয়ামী লীগ প্রধান বা সভাপতি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশ চলতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-এর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনের খোলা জায়গায় সমাবেশ শেষে মিছিল হবে।

২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় হতবিহ্বল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শহিদদের কয়েকজন

বিশাল প্রস্তুতি। কার্যালয়ের সামনে ট্রাক দিয়ে একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। সেই মঞ্চে ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা।

আমারো সৌভাগ্য হয়েছিল সেই সমাবেশে যোগ দেওয়ার। নারায়ণগঞ্জ থেকে আমিও এসেছিলাম। আমরা ছিলাম পীর ইয়ামেনি মার্কেটের বিপরীতে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে প্রবেশের মুখে।

লোকে লোকারণ্য।

তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

নেতাদের বক্তব্যের পরই শুরু হয় প্রধান অতিথির ভাষণ। আওয়ামী লীগ সভাপতি যখন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলে বক্তব্য শেষ করেছেন তখনই সেই নারকীয় গ্রেনেড হামলা শুরু হয়।

গ্রেনেড বিস্ফোরণে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগের প্রাণ ভোমরা শেখ হাসিনাকে বাঁচাতে নেতারা এবং তার দেহরক্ষীরা তৈরি করেন মানব ঢাল। রক্তাক্ত হন নেতারা। রক্তস্রোতে ভেসে যায় পুরো এলাকা। সামনের রাস্তায় পড়ে থাকে মানুষের দেহ। কারো দেহ থেকে হাত-পা বিচ্ছিন্ন। কেউ পড়ে আছেন রক্তাক্ত শরীরে। গগনবিদারী চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

সেদিন আল্লাহর কুদরতে ট্রাকের পাশের গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হয়নি। যদি সেটা বিস্ফোরিত হতো তাহলে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাসহ নেতারা কেউই বাঁচতে পারতেন না। স্রষ্টার অপার লীলা। আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী বেঁচে আছেন। মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে, বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সেবা করার জন্যই হয়ত আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সেদিনের সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের স্ত্রী আইভি রহমানসহ নিহত হন ২৪টি তাজা প্রাণ। আইভি রহমান অবশ্য মারাত্মক আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। আহত হন প্রায় ৫ শতাধিক। জীবনের তরে পঙ্গু হয়েছেন অনেকে।

সেই হামলায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও বাম কানের শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বেঁচে আছেন বলেই আমরা পদ্মা সেতুর মতো বড়ো সেতু তৈরির স্বপ্ন দেখেছি। আর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তব হতে চলেছে। বাংলাদেশ খাদ্যঘাটতি থেকে মুক্তি পেয়েছে। মঙ্গা নেই দেশে। সমুদ্র জয় করেছি আমরা। বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে নিয়ে গেছেন তিনি তাঁর সুপরিকল্পনার মাধ্যমে। আমরা এমন নেতৃত্বই চাই। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা হবেই। আল্লাহ আমাদের এই স্বপ্ন দেখানো মানুষটিকে আমাদের মাঝে রাখুন। সুস্থ থাকুন এই কামনা করি।

৬ই আগস্ট

হিরোশিমা দিবস

লিটল বয় থেকে ফ্যাটম্যান

মো. শিপলু জামান

বাবার সাথে প্রশ্ন প্রশ্ন খেলছে শিজা। খেলাটা হলো বাবা একটা প্রশ্ন করবে, শিজা উত্তর দিবে। আবার শিজা প্রশ্ন করবে, বাবা উত্তর দিবে। আর মা বসে বসে রেফারির দায়িত্ব পালন করবে। উত্তর পারলে এক পয়েন্ট। না পারলে নাই। খেলা শুরু হলো এভাবে-

বাবা- ‘জ’ দিয়ে একটা দেশের নাম বলো তো।

শিজা হেসে কুটিকুটি। বলে, এটা তো খুবই সহজ। প্রশ্ন কি এত সহজ হয় নাকি?

আসলে বাবা ইচ্ছা করেই সহজ প্রশ্ন করছে যাতে আদুরের রাজকন্যা উত্তর দিতে পারে; আর উত্তর দেওয়ার আনন্দে কন্যার চোখেমুখে যে খুশির আতশবাজি ফুটবে, সেটা দেখে বাবার কলিজা ঠান্ডা হবে।

ততক্ষণে শিজা উত্তর দিল, জ তে জাপান।

এবার শিজার প্রশ্ন- বলো তো জাপান কোন মহাদেশে?

বাবা কিছুক্ষণ না পারার ঢং করে বলল-এশিয়া। শিজা লাফিয়ে উঠল- ঠিক বলেছ।

প্রশ্ন করার পালা বাবার। বলো তো, জাপানের পূর্ব নাম কী?

এবার শিজা একটু ধাক্কা খেলো। অনেকক্ষণ চেষ্টা করছে, হুমহুম আওয়াজ করছে বিড়ালের মতো আর গালে আঙুল রেখে চিন্তা করছে। বাবা বুঝতে পেরেছে, প্রশ্নটা কঠিন হয়ে গেছে।

বাবা পারছি না, সারেন্ডার।

বাবা তখন বলে, জাপানের নাম আগে ছিল নিপ্পণ। এর অর্থ, সূর্যোদয়ের দেশ।

শিজা এখন জাপান সম্পর্কে জানতে আরো আগ্রহী হয়ে উঠল। বলে, বাবা জাপান নিয়ে আরো মজার মজার কথা বলো তো।

বাবা বলা শুরু করে।

জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ। হোক্কাইডো, হনশু, শিকোকু ও কিউসু এই চারটি দ্বীপ নিয়ে জাপান গঠিত। হনশু তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও প্রধান। পাহাড়, ফুল, সাগর, ঝর্না ইত্যাদি দিয়ে সাজানো সুন্দর দেশ জাপান। এদেশের মানুষ খুব পরিশ্রমী ও সহজ সরল। শিজা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

একটু থেমে বাবা আবার বলছে, টোকিও হলো জাপানের রাজধানী। এছাড়া ওসাকা, কিওটো, ফুকুওকা, হিরোশিমা, নাগাসাকি প্রভৃতি হলো জাপানের অন্যতম বড়ো শহর।

বাবা বলল, এবার তোমাকে জাপানের একটি দুঃখের গল্প বলব, তবে গল্পটা সত্যি। শিজা উঠে বসল, আরো উৎসুক ভাব তার মধ্যে।

বাবা বলছে, ১৯৪৫ সাল, পৃথিবীতে চলছে ভয়াবহ যুদ্ধ; যাকে বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের দুটি পক্ষ ছিল, এক দিকে জার্মান, জাপান, ইতালি ও তাদের সঙ্গী রাষ্ট্র আর অন্য পক্ষে আমেরিকা, রাশিয়া, চীনসহ অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র।

শিজা বলছে, বাবা যুদ্ধে কী হলো, কে জয়ী হলো। বাবা তাকে থামিয়ে বলা শুরু করল,

হিরোশিমা শহর, ৬ই আগস্ট, সকাল ৮.৩০টা, যুদ্ধের দামামার মধ্যেই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা স্কুলের জন্য বের হয়েছে, বড়োরা কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। ঠিক সে সময় বিশ্ব-মানবতার ইতিহাসে এক জঘন্য ও দুঃখের ঘটনা ঘটল। আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা শহরে প্রায় ৯৭০০ পাউন্ডের এক বোমা মারল, যার নাম ছিল ‘লিটল বয়’। এটি ছিল বিশ্বের যে-কোনো যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রথম পারমাণবিক বোমা। ১৪০ পাউন্ড ইউরোনিয়াম সমৃদ্ধ বোমাটির বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল প্রায় ১৫০০০ টন। সেই লিটল বয়ের আঘাতে প্রায় এক লক্ষ ৪০ হাজার জন লোক মারা যায়, সে ছিল এক ভয়ংকর পরিবেশ। বাড়িঘর, গাছপালা সব বিদ্ধস্ত হয়। চারিদিকে শুধু আগুন আর

আগুন। আগুনে ঝলসে যায় মানুষের শরীর। অনেকের চামড়া ও মাংস খসে পরে। অনেক লোক পঙ্গু হয়ে যায়। এরপরে অনেক বছর সেখানে বাচ্চারা পঙ্গু হয়ে জন্ম নিত এবং ক্ষেতে ফসল হতো না।

শিজার চোখে-মুখে ভয়। ভীতু আতঙ্কিত কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, বাবা, পারমাণবিক বোমা কী? লিটল বয় এত শক্তি পায় কীভাবে?

বাবা এবার হেসে পরিবেশকে একটু হালকা করার চেষ্টা করল।

বাবা বলছেন, ‘লিটল বয়’ হলো সেই পারমাণবিক বোমার নাম, আর বোমার নাম লিটল বয় কেন দেওয়া হয়েছিল সেটা আমি জানি না। আর পারমাণবিক বোমা হলো অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা যা নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহার করে ও চেইন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়াতে পারে।

বাবা বললেন, এখানেই শেষ নয়, ৯ই আগস্ট ১৯৪৫, ভোর ৩.৪৭, তখনো কেউ ঘুম থেকে উঠে নাই। এবার মার্কিন বাহিনী জাপানের আরেক বড়ো শহর নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলল। এটার নাম ছিল ‘ফ্যাট ম্যান’ যার ওজন ছিল ১০,৮০০ পাউন্ড, ফলে প্রায় ৭৪ হাজার মানুষ মারা যায় এবং অনেকে পঙ্গু হয়ে যায়।

বাবা বলছেন, শুনো, জাপানই একমাত্র দেশ যেখানে যুদ্ধের সময় পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছে। শিজা ভয় পেয়েছে আবার গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেও।

শিজা জিজ্ঞেস করল, মানুষ কেন যুদ্ধ করে, কেন অন্য মানুষকে মারে।

বাবা শিজাকে কাছে টেনে নিলো, আদর করল এবং বলল, যুদ্ধ করা ভালো নয়। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।

মানুষ বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ করে, কখনো নিজের অস্তিত্ব ও অধিকার রক্ষায় যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। যেমন- বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে স্বাধীন দেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। আবার অনেক দেশ অন্যায়ভাবে অন্য দেশ দখল করতে কিংবা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য যুদ্ধ সৃষ্টি করে যেমন ইসরাইল ফিলিস্তিনের সাথে করছে। তবে যুদ্ধ যেভাবেই শুরু হোক না কেন, যুদ্ধ কোনোভাবেই কাম্য নয়, যুদ্ধ শুধু ধ্বংস করতে পারে আর মানুষকে কষ্ট দিতে পারে।

তবে...

শিজা একটু নড়েচড়ে বসল।

যুদ্ধ করতে হবে নিজের সাথে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের সাথে যুদ্ধ করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হবে। নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করতে হবে যেন আমরা কারো সাথে অন্যায়-অত্যাচার না করি, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকি, মাদক থেকে দূরে থাকি, বাবা-মা ও শিক্ষকদের কথা মেনে চলি এবং একজন ভালো মানুষ ও আদর্শ নাগরিক হয়ে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে পারি।

শিজা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। বাবা বলছে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, একজন মানুষের অন্যজনকে মারা বা কষ্ট দেওয়া ভালো না। তাই সবসময় সবার সাথে মিলেমিশে থাকবে, ভালো কাজ করবে। ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবে। এখানেই জীবনের সার্থকতা।

শান্তির দূত

জয়া সূত্রধর

মেয়েটির নাম চঞ্চলা। ওর বন্ধুদের কাছে এটি বেশ কঠিন একটি নাম। অনেকেরই উচ্চারণে বেধে যায়। তাই যে যার মতো করে মূল নামের সাথে মিল রেখে সুবিধাজনক নামে ডাকে। কেউ ডাকে চঞ্চা, কেউ চন্ লা, কেউ চনু, কেউ আবার পুরোটা বলতে গিয়ে চনোচলা বলে ফেলে।

ওরা সবাই ৪ থেকে ৫ বছর বয়সের মধ্যে। সারাদিন খেলা, হইচই, আনন্দে মেতে থাকে ওরা। ফুল, লতাপাতা দিয়ে ঘর বানিয়ে সিলভারের খেলনা হাঁড়ি-পাতিলে রোজ অন্তত একবার চড়ুইভাতি হওয়া চাই। তবে বেশ কয়েকদিন থেকে চড়ুইভাতি, পুতুল বিয়ে ছাড়াও চঞ্চলা আরো একটি খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওর সাথি বন্ধুরা খুব আগ্রহ নিয়ে কাজ দেখে। চঞ্চলাকে অনুকরণ করে নিজেরাও কাজ করে। নতুন খেলা শুরু হবে, সবাই খুব খুশি। খেলার নামটি এখনো কেউ জানে না।

চঞ্চলা ঘর থেকে মায়ের শাড়ি, ওড়না এনে পাটখড়ির সাথে সেগুলো ঝুলিয়ে ঘরের মতো বানাচ্ছে। চঞ্চলা বলেছে, এগুলো নাকি তাঁবু হবে।

তাকিয়ে থেকে থেকে জানার ইচ্ছাটাকে চাপাতে না পেরে সুমি প্রশ্ন করল, চঞ্চা, তাঁবুতে কী হবে রে?

চঞ্চলা হাতে নিজের মুখ চেপে আধো হাসি আধো ভাব নিয়ে বলল, ও পরে সব বুঝে যাবি, সুমি।

সুমির মতো অন্যরাও পরে বোঝার অপেক্ষা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনদিনেই ওরা ছয়-সাতটি ঘর বানিয়ে ফেলল। কতগুলো কলাগাছের ফাতরা যোগাড় করে টেনে নিয়ে এল। মানুষের কাছ থেকে গাছের ডালপালা চেয়ে এনে মাটি খামচে খামচে ঘরগুলোর চারদিকে বসিয়ে দিল। এবার সবাই বুঝে ফেলল, খেলা শুরু হতে আর বাকি নেই। চঞ্চলা সবাইকে নিয়ে একটি ঘরে বসল। বলল, চলো, কলাগাছের পাতা দিয়ে পতাকা বানাবো।

কেমন করে? জানতে চায় তুলি।

মাথায় বুদ্ধি আসে না কীভাবে বানাবে। রাজীবের বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ ভালো। সে একটা কলাপাতা থেকে খানিকটা চারকোনা করে ছিঁড়ে পতাকা বানিয়ে ফেলল। চঞ্চলা বলল, কিন্তু এটা আমরা মাথায় পড়ব কী করে?

মহাচিন্তায় পড়া গেল তো! সবাই যার যার মতো করে ভাবছে। সমাধানটা অবশ্য রিনি ফুফু দিল। রিনি ফুফু ওদের খেলা দেখতে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ফুফু কলার ফাতরা থেকে রশির মতো চিকন করে ছিঁড়ে নিল। নখের মাথা দিয়ে কলাপাতার পতাকায় কয়েকটি ছিদ্র করে ফাতরার সুতো দিয়ে তা গেঁথে দিল। এখন সবাই এ কাজটাই বারবার করতে লেগে গেল। ভারি মজার। এত সোজা হবে কে জানত? মনে মনে রিনি ফুফুকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার নতুন কাজের কথা বলে চঞ্চলা।

আমাদের রিনি, ঝিনি, পলাশ, মিনু, টম, লালু, টুকি, তমা, বুলবুলি, ময়না সবাইকে তাঁবুতে নিয়ে আসব এখন। চলো।

এগুলো ওদের পুতুলদের নাম। খেলা খুব জমে উঠেছে। তাই পরে কী হবে তা আর জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে কারোর নেই। শুধু বৃষ্টি আপত্তি করে বলল, চল না, আমার লিমার খুব অসুখ যে!

লতা ভরসা দিয়ে বলল, আমি ওকে কোলে করে নিয়ে আসব, চল।

লিমা ছাড়া সবাই ঝুড়ির বাক্সে দুলতে দুলতে চলে এল।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পছন্দ মতো ঘরে যার যার পুতুল নিয়ে খড় দিয়ে বানানো বিছানায় শুইয়ে,

> **‘আমার বাবা খারাপ মানুষদের হাত থেকে ভালো মানুষদেরকে বাঁচায়। নতুন তাঁবু করে তাদের ওইখানে নিয়ে যায়, খাবার দেয়, অসুখ হলে ডাক্তারও দেখায়। আমরা এখন বাবার মতো কাজ করব।’**

কেউ কেউ আবার কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়ে আসলো। ঘরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে চঞ্চলা সবাইকে কলাপাতার জামা পরিয়ে দিল। অপটু হাতে পরাতে গিয়ে দুই একটা জামা ছিঁড়ে গেলেও কেউ মুখ গোমড়া করল না। পতাকা মাথায় পেঁচিয়ে ঘাড়ের কাছে বেঁধে দিল একে অপরকে।

এরপর চঞ্চলা সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, শোনো, আমাদের রিনি, ঝিনি, লিমা, পলাশ, বুলবুলি সবাই যুদ্ধের দেশে থাকে।

চঞ্চলার বন্ধুরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। চঞ্চলার মতো অত কিছু বুঝে না ওরা। মনা নামের ছেলেটি কোনো বিষয় না বুঝলেই হেসে ফেলে। এখনো তাই করল। হাসতে হাসতে চোখ আকাশে তুলে বলল, যুদ্ধের দেশ?

চঞ্চলা বলল, মানুষেরা ঝগড়া করে মানুষদেরকে মেরে ফেললে ওইটাকে যুদ্ধের দেশ বলে। বুঝলি?

মনা ও সবাই বুঝতে পারার আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

চঞ্চলা আবার বলল, খারাপ মানুষেরা ভালো মানুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তাদের না খাইয়ে রাখে। কষ্ট দেয়। আমার বাবা খারাপ মানুষদের হাত থেকে ভালো মানুষদেরকে বাঁচায়। নতুন তাঁবু করে তাদের ওইখানে নিয়ে যায়, খাবার দেয়, অসুখ হলে ডাক্তারও দেখায়। আমরা এখন বাবার মতো কাজ করব।

পিপাসা, তুলি, মনা ওদের বেশ মনে পড়ে গেল, চঞ্চার বাবা বিদেশ থেকে মোবাইলে কী যেন পাঠায়। চঞ্চা বলেছে, ওইগুলো ওর বাবার কাজের ভিডিও। চঞ্চার সাথে বসে থেকে একমনে ওরাও মানুষের হাঁটাচলা, নড়াচড়া আরো কত কী দেখেছে! আর আজ কিনা ওরা সেই ভিডিও ভিডিও খেলবে।

উফস! কী আনন্দ।

লাইন ভেঙে চঞ্চলাকে সবাই ভিড় করে দাঁড়ালো। চঞ্চলার মাও এসেছেন। কাকি মুখে মিষ্টি হাসি টেনে বললেন, ও মা! তোমরা শান্তিরক্ষী সেজেছ? বাহ্! আমি তো জানতেই পারলাম না। তবে এখানে আমার চারপাশে বসো। আমি একটা জিনিস দেখাই তোমাদের।

সবাই বসল। চঞ্চলার মা হাতে মোবাইলের চাইতে বড়ো একটি যন্ত্র চালিয়ে দিলেন। তাতে টেলিভিশনের মতো সব দেখা যাচ্ছে।

রন্তু ফিসফিস করে বলল, ভিডিও, ভিডিও।

বাকি সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে রন্তুর কথায় সায় দিয়ে ভিডিও দেখতে লাগল।

ভিডিও ক্লিপটি দেখাতে দেখাতে চঞ্চলার মা বলতে লাগলেন, এই যে লতাপাতা আর জঙ্গলে ঘেরা জায়গা দেখতে পাচ্ছ, এটা আফ্রিকা। এখানে একটি দেশ আছে। তার নাম মালি।

এই দেশের মানুষের মধ্যে শুধুই হানাহানি, মারামারি। ওই, ওই যে পোশাক পড়া লোকগুলো দেখছ, তারা সবাই বাংলাদেশি।

চঞ্চলা একজনকে দেখিয়ে বলল, ওই যে বাবা।

চঞ্চলার মা বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, মা। আমাদের দেশের অনেক সেনা সদস্যের মতো তোমার বাবাও ওখানে মারামারি বন্ধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে থেকে ওই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছেন তারা। আবার মানুষরা যাতে কষ্টে না থাকে সেজন্য তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিচ্ছেন, খাবার দিচ্ছেন, চলাচলের রাস্তাঘাটও তৈরি করে দিচ্ছেন।

চঞ্চলা মায়ের কপালে আদর বুলিয়ে দিয়ে বলল, মা, আমরা সব্বাই মিলে শান্তিরক্ষী বাহিনী বানিয়েছি।

মা হেসে সবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে যান।

বিকেল পড়ে এল। চঞ্চলা আর সবাই মিলে ঠিক করল, যুদ্ধের দেশ থেকে তাঁবুতে যে পুতুলগুলো ওরা এনেছে সন্ধ্যার আগেই তাদের জন্য খাবার আনবে। পরিকল্পনা সাজিয়ে নেয় ওরা। কয়েকজন ওদের তাঁবুর কাছে পতাকা মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। বাকিরা জঙ্গল থেকে খাবার আনতে গেল। রফিক ঘুরেফিরে তাঁবুর কাছে এসে বলল, তোরা যাবি না?

চঞ্চলা বলল, কাল তোরা ওদেরকে পাহারা দিবি আর আমরা ওদের খাবার আনতে যাব। নইলে যে-কোনো সময় দুষ্টু লোকেরা এসে ওদেরকে মারতে পারে।

পরদিন সকালবেলা। সূর্যের লাল আলোয় আকাশ ভরে গেল। গতরাতে যার যার বাড়িতে গিয়ে তাঁবু আর পুতুলদের কথা ভাবতে ভাবতে সবাই মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকাল হতে ঠিকই সবাই তাঁবুর সামনে হাজির হয়ে গেল।

খাবার আর পানি এনে দিয়ে পাহারায় থেকে টহল দিতে শুরু করল টুটুল, রনি আর তমা।

সুমি আর রাজীব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুতুলদের অসুবিধা কী কী আছে তা জেনে নিচ্ছে। বাকিরা কাগজের ঠোঙায়

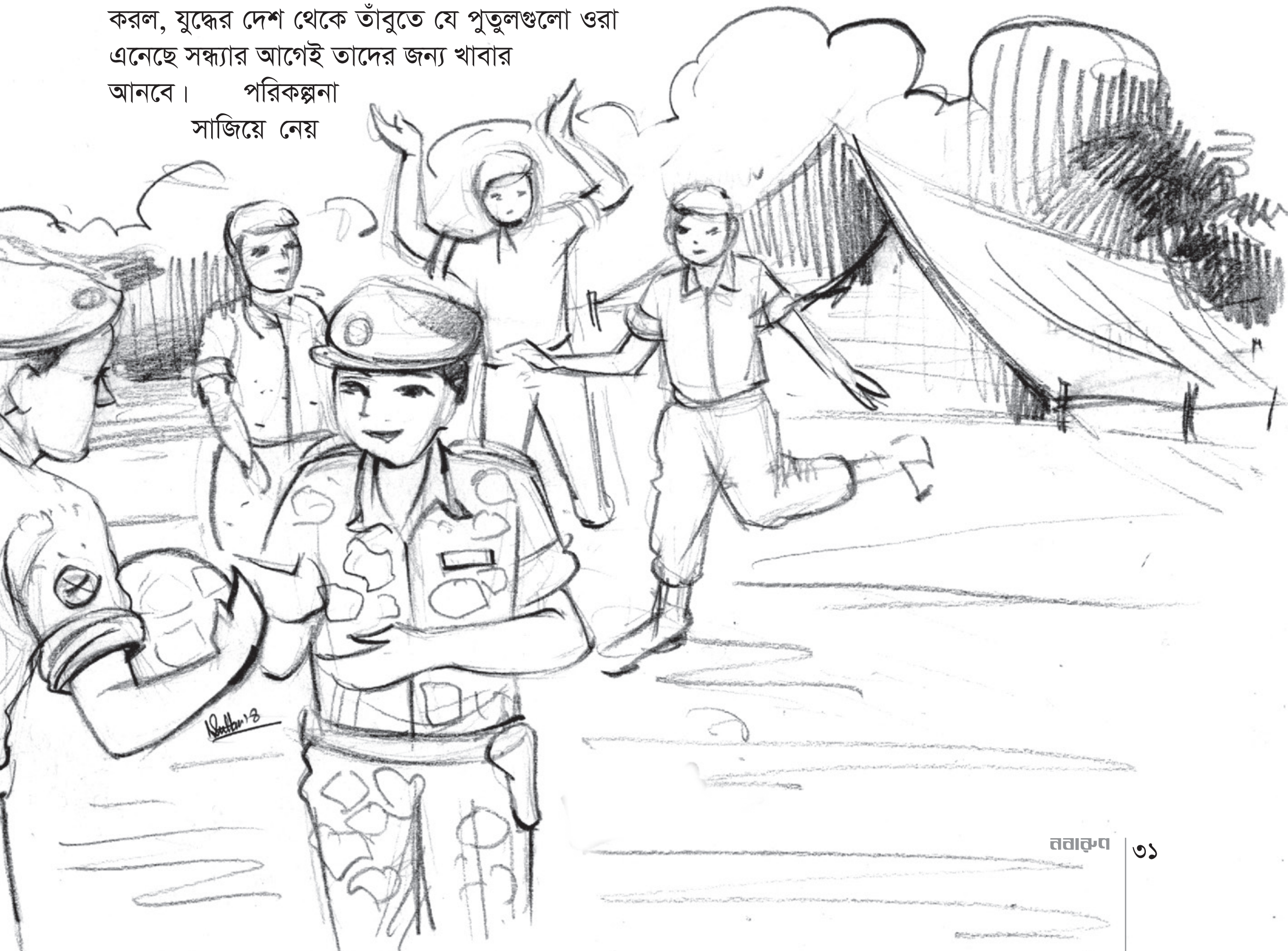

করে বালুমাটি এনে প্রতিটি তাঁবুর সামনে রাস্তা তৈরি করছে।

মনা বলল, চলো। আজকে ওদের জন্য রাস্তা বানাই।

দুপুরে খাবারের বিরতি। বিকেলে আবার কাজ শুরু হলো। সবাই ব্যস্ত সময় পার করছে। এমন সময় কোথা থেকে হট্টগোল ভেসে আসল। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি বুঝতে চাইল। ওরা নিমগ্ন ওদের কাজে। কিন্তু হট্টগোল বাড়তে লাগল। মানুষের হইচই চিৎকার চেঁচামেচিতে কানে তালা লাগার অবস্থা। অনেকগুলো লোক লাঠিসোটা নিয়ে এদিকেই দৌড়ে আসছে। আর তাদের সামনে সামনে দৌঁড়াচ্ছে একজন মানুষ। তার হাত খালি। মাগো, বাবাগো, বাঁচাও বলে ছুটে এসে তাঁবুর উপরে পড়ে গেল। ম্যাড়ম্যাড়ে তাঁবুগুলো নেতিয়ে পড়ল মাটিতে।

তুলি, পিপাসা, মনা, সুমি তাঁবু ভাঙার কষ্টে কেঁদে ফেলল। এদিকে পেছনের লোকগুলো ওই লোকটাকে ধরে ফেলেছে। সবাই মিলে লোকটাকে জোরে ধমকাচ্ছে। মার, মার, বলে মারার জন্য লাঠিও তুলে ফেলল।

চঞ্চলা কলাপাতার জামা আর টুপি পরে নিজেকে কাল্পনিক সৈনিক ভেবে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

এতটুকু শিশুর কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। ভিড় থেকে কেউ একজন বলে উঠল, বাচ্চা কার? সরান। নইলে কোনো বিপদ ঘটলে দায়ী করতে পারবেন না।

কেউ এগিয়ে এল না। চঞ্চলাই আরেকটু ভিতরে ঢুকে গেল। ভিড় ঠেলে মার খাওয়া লোকটিকে পিছনে রেখে নিজে সামনে দাঁড়ালো।

বলল, মারামারি হবে না। আমরা জাতিসংগের (জাতিসংঘের) শান্তিরক্ষী বাহিনী। আমরা মারামারি চাই না। চলো, সবাই মিলেমিশে থাকি।

চঞ্চলার সাহস দেখে বন্ধুরাও সব চঞ্চলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা বলতে লাগল, তোমরা মেরো না। এটা মন্দ কাজ।

একজন ওদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল। বলল, যাও বাবারা, খেলা করো গিয়ে।

চঞ্চলা বলল, খেলব। কিন্তু বাবা যে সবাইকে শান্তির কথা বলে! তোমরা বলো, ঝগড়া করবে না তো?

নাছোড়বান্দা বাচ্চাদের পাল্লায় পড়ে লাঠি নামিয়ে ফেলে সবাই।

তবুও মতের শেষ নেই। কেউ কেউ বলল, বাচ্চা মানুষ। ওরা কী বুঝে? গেন্দা আমাদের অনুমতি না নিয়ে আমাদের বাগানে ওর ইচ্ছেমতো গাছ লাগিয়ে আসে? ওর বাপের সম্পত্তি পাইছে? গাছ লাগানোর সাধ না মিটাইলে আবারো লাগাবে।

লোকটা কাঁদতে লাগল। বলল, আমার তিনকূলে কেউ নেই। অন্যের বাড়িতে থাকি। আমারে মাইরেন না। ওই গাছের দাবি আমি কোনোদিন করুম না। বাঁইচা থাকতে দুই-একটা ফল খাওয়াইয়েন তাইলেই হইব।

আরেকজন বলল, ঠিক আছে, ওই বাচ্চাগুলোর মাথা ছুঁয়ে কসম কাট।

লোকটি তাই করল।

সবাই চলে যাওয়ার আগে চঞ্চলার মা এগিয়ে এলেন। সবার মাঝে নিজের ও চঞ্চলার বাবার পরিচয় দিলেন। তারপর বললেন, আমার স্বামী দেশের বাইরে গিয়ে ভিনদেশি মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি নেই এটা জানলে চঞ্চলার বাবার মতো শান্তিরক্ষী মিশনের সকল সদস্য কষ্ট পান। আসুন, ছোটোখাটো বিভেদ ভুলে আমরা শান্তিতে বসবাস করি।

কথাগুলো সবার অত্যন্ত ভালো লাগল। অনেক আলাপচারিতার পর সবাই বিদায় নিতে এল চঞ্চলা আর তার বন্ধুদের কাছ থেকে। এতিম লোকটি বলল, পড়ে গিয়ে তোমাদের তাঁবু ভেঙে ফেলেছি। আমিই গড়ে দেব মামনি।

প্রতিপক্ষের একজন এগিয়ে এসে বলল, অবশ্যই দেব। ওরা যে আমাদের দেশের শান্তির দূত। তারপর চঞ্চলার হাত ধরে বলল, তোমাদের শান্তি শান্তি খেলায় আমরাও আছি মামনি। আমাদের জাতির পিতা সারাজীবন দেশ ও বহির্বিশ্বের শান্তি রক্ষায় সোচ্চার ছিলেন। তোমাদের মাঝে বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে পেলাম আজ।

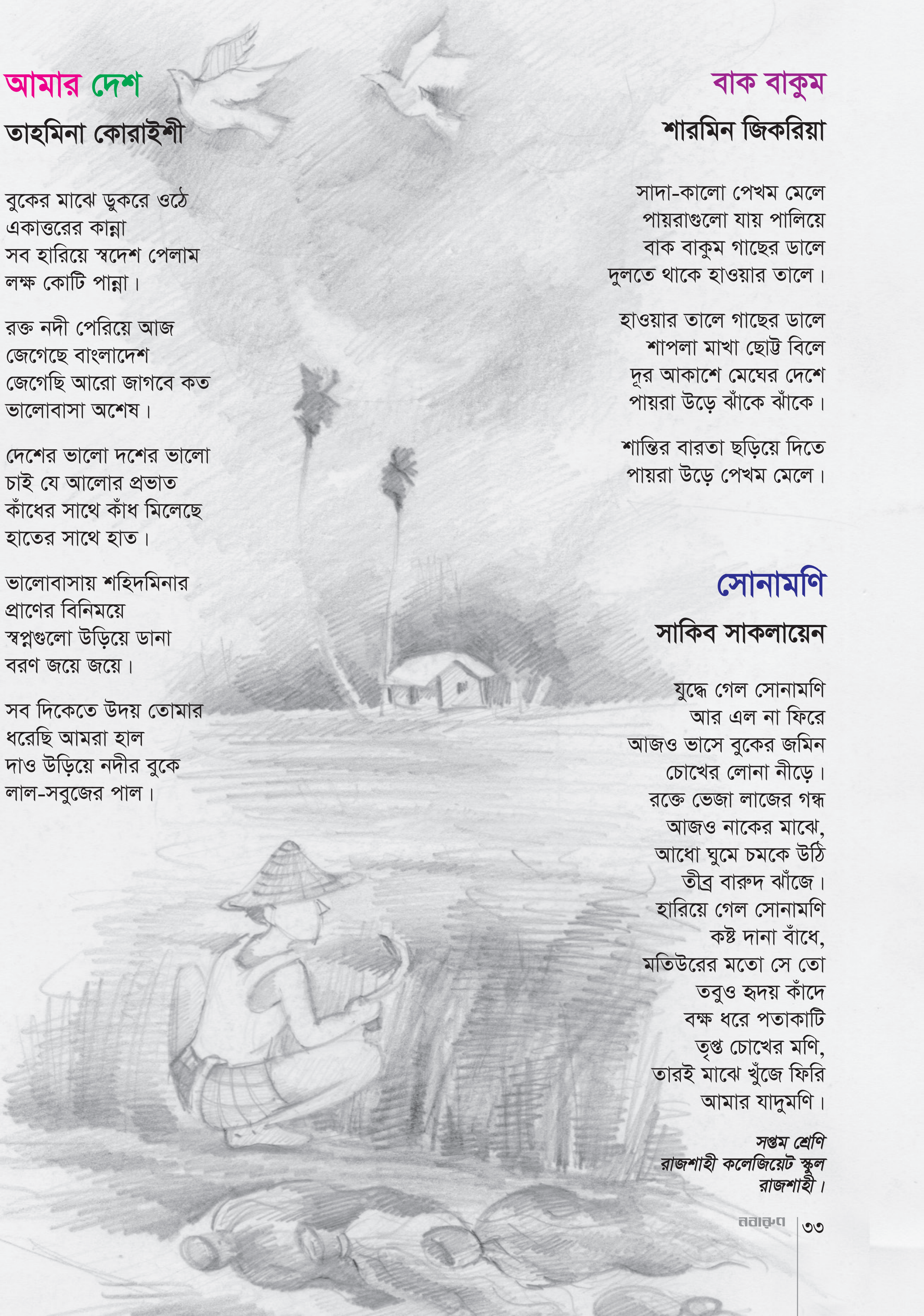

আমার দেশ

তাহমিনা কোরাইশী

বুকের মাঝে ডুকরে ওঠে
একাত্তরের কান্না
সব হারিয়ে স্বদেশ পেলাম
লক্ষ কোটি পান্না।

রক্ত নদী পেরিয়ে আজ
জেগেছে বাংলাদেশ
জেগেছি আরো জাগবে কত
ভালোবাসা অশেষ।

দেশের ভালো দশের ভালো
চাই যে আলোর প্রভাত
কাঁধের সাথে কাঁধ মিলেছে
হাতের সাথে হাত।

ভালোবাসায় শহিদমিনার
প্রাণের বিনিময়ে
স্বপ্নগুলো উড়িয়ে ডানা
বরণ জয়ে জয়ে।

সব দিকেতে উদয় তোমার
ধরেছি আমরা হাল
দাও উড়িয়ে নদীর বুকে
লাল-সবুজের পাল।

বাক বাকুম

শারমিন জিকরিয়া

সাদা-কালো পেখম মেলে
পায়রাগুলো যায় পালিয়ে
বাক বাকুম গাছের ডালে
দুলতে থাকে হাওয়ার তালে।

হাওয়ার তালে গাছের ডালে
শাপলা মাখা ছোট্ট বিলে
দূর আকাশে মেঘের দেশে
পায়রা উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।

শান্তির বারতা ছড়িয়ে দিতে
পায়রা উড়ে পেখম মেলে।

সোনামণি

সাকিব সাকলায়েন

যুদ্ধে গেল সোনামণি
আর এল না ফিরে
আজও ভাসে বুকের জমিন
চোখের লোনা নীড়ে।
রক্তে ভেজা লাজের গন্ধ
আজও নাকের মাঝে,
আধো ঘুমে চমকে উঠি
তীব্র বারুদ ঝাঁজে।
হারিয়ে গেল সোনামণি
কষ্ট দানা বাঁধে,
মতিউরের মতো সে তো
তবুও হৃদয় কাঁদে
বক্ষ ধরে পতাকাটি
তৃপ্ত চোখের মণি,
তারই মাঝে খুঁজে ফিরি
আমার যাদুমণি।

সপ্তম শ্রেণি
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল
রাজশাহী।

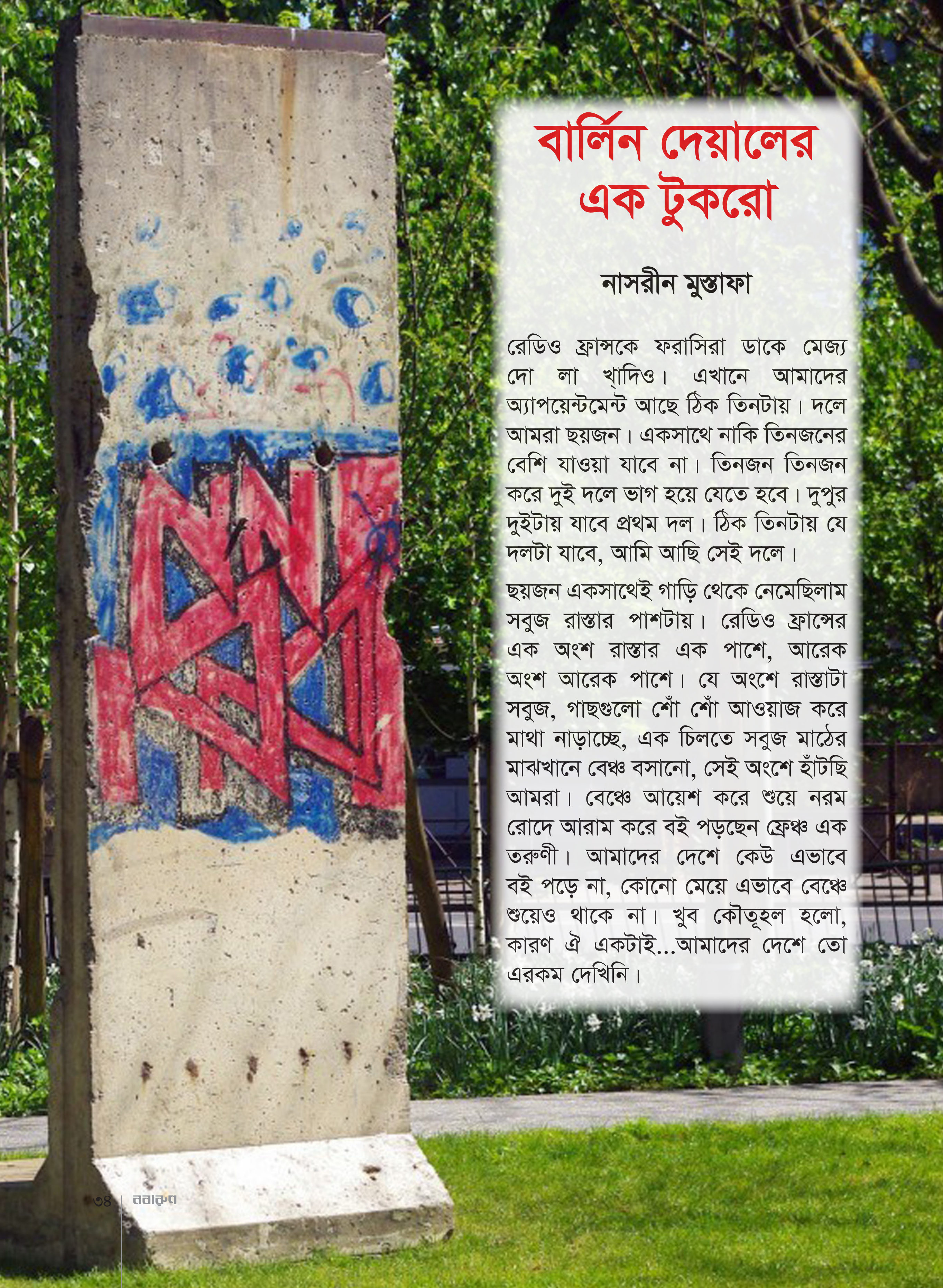

বার্লিন দেয়ালের এক টুকরো

নাসরীন মুস্তাফা

রেডিও ফ্রান্সকে ফরাসিরা ডাকে মেজ্য দো লা খ্াদিও। এখানে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ঠিক তিনটায়। দলে আমরা ছয়জন। একসাথে নাকি তিনজনের বেশি যাওয়া যাবে না। তিনজন তিনজন করে দুই দলে ভাগ হয়ে যেতে হবে। দুপুর দুইটায় যাবে প্রথম দল। ঠিক তিনটায় যে দলটা যাবে, আমি আছি সেই দলে।

ছয়জন একসাথেই গাড়ি থেকে নেমেছিলাম সবুজ রাস্তার পাশটায়। রেডিও ফ্রান্সের এক অংশ রাস্তার এক পাশে, আরেক অংশ আরেক পাশে। যে অংশে রাস্তাটা সবুজ, গাছগুলো শোঁ শোঁ আওয়াজ করে মাথা নাড়াচ্ছে, এক চিলতে সবুজ মাঠের মাঝখানে বেঞ্চ বসানো, সেই অংশে হাঁটছি আমরা। বেঞ্চে আয়েশ করে শুয়ে নরম রোদে আরাম করে বই পড়ছেন ফ্রেঞ্চ এক তরুণী। আমাদের দেশে কেউ এভাবে বই পড়ে না, কোনো মেয়ে এভাবে বেঞ্চে শুয়েও থাকে না। খুব কৌতূহল হলো, কারণ ঐ একটাই...আমাদের দেশে তো এরকম দেখিনি।

তরুণীকে দেখতে গিয়ে দেখি স্মৃতিস্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে কিছু একটা। খুব গম্ভীর ভাব করে দাঁড়ানো সেই কিছু একটা ধূসর এক দেয়ালের মতো। ঘুরে যেই পেছনে যাই, দেখি সেখানে লাল রঙের মাতব্বরি মেনে করা চমৎকার এক গ্রাফিতি। দেয়ালটার পাশে সত্যিই এক স্মৃতিস্মারক, তাতে পরিষ্কার ফ্রেঞ্চ আর ইংরেজি লেখা কিছু কথা। জানতে পারলাম, এই দেয়াল যে সেই দেয়াল নয়! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে বার্লিন দেয়ালের পতন হয়েছিল বলে পড়েছিলাম ইতিহাসের বইয়ে। এই দেয়াল হচ্ছে সেই বার্লিন দেয়ালের একটা টুকরো। যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি মনে করিয়ে দিতেই দেয়ালটিকে ভাস্কর্যের মতো করে রাখা হয়েছে।

বার্লিন দেয়ালের ইতিহাস মনে পড়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পূর্ব আর পশ্চিম অংশের মধ্যকার তিক্ততা যুদ্ধের পরও গেল না। ১৯৪৫ সালে শেষ হলো যুদ্ধ। অথচ এরও ষোলো বছর পর ১৯৬১ সালে জার্মানির রাজধানী বার্লিনকে দুইভাগে ভাগ করা হলো। ভাগ করতে লাগবে একটা দেয়াল। সমাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে থাকা পূর্ব জার্মানির বানানো কংক্রিটের সেই দেয়ালের নামই বার্লিন দেয়াল। পশ্চিম জার্মানিতে বহাল ছিল পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র।

ভাগাভাগির এ দেয়ালকে অনেকেই নাম দিয়েছে ‘লজ্জার দেয়াল’ বা *ওয়াল অব* শেইম নামে। দেয়াল টপকে পশ্চিম বার্লিন গেলেই হয়। ওখান থেকে পশ্চিম ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে অভিবাসন করা সহজ ছিল। পূর্ব বার্লিন সরকার কড়া হুকুম দিয়েছিল- দেয়াল টপকাতে দেখলেই গুলি করা হবে। প্রায় এক লাখ লোক টপকাতে চেয়েছেন দেয়াল, পাঁচ হাজার জন নাকি পেরেও ছিলেন। প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় ২০০ জন পূর্ব বার্লিনবাসী। আহা!

১৯৮৯ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত ছিল দেয়ালটা। এর এক পাশে পূর্ব বার্লিন, আরেক পাশে পশ্চিম বার্লিন। পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরিতে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব শুরু হলো ঐ সময়। এর প্রভাব পৌঁছে গেল পূর্ব জার্মানিতেও। ‘দেয়াল হটাও’ বলে স্লোগান দেওয়া শুরু হলো। পথে নেমে এল রেগে ওঠা মানুষগুলো। পুলিশের ধরপাকড়েও কাজ হলো না। প্রথমে ঘোষণা এল, পূর্ব জার্মানিরা চাইলে পশ্চিম জার্মানি বেড়াতে যেতে পারবে। মানুষের স্রোত দেয়ালের দুই পাশে উৎসবে মেতে উঠল। কেউ কেউ দেয়াল ভেঙে টুকরো করতে শুরু করল। অবশেষে সরকারি সিদ্ধান্তে ভারী অস্ত্রপাতি দিয়ে সরানো হলো দেয়ালটা।

১৯৯০ সালের ১৩ই জুন দেয়াল সরানোর কাজ শুরু হলো। পাক্কা দুই বছর লেগে গেল এ কাজে। দেয়াল সরে গেলে আর মিল হতে কী বাধা থাকে? যুদ্ধ জার্মানিকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। আর দেয়াল সরে যেতেই দুই অংশ মিলে গেল। জার্মানি হয়ে গেল গোটা একটা দেশ। পূর্ব আর পশ্চিম বলে কিছু রইল না। কী দরকার থাকার?

দরকার নেই। তবে বিভেদের স্মৃতিকে মনে রাখার কিন্তু দরকার আছে। তাহলে সবাই বুঝবে, শান্তির কত দরকার। আর তাই বার্লিন দেয়ালটার নানান টুকরো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠানো হলো। কিছু কিছু নাকি স্যুভেনির হিসেবে বিক্রিও হয়েছিল। আমাদের ঢাকার ধানমন্ডিতে বেঙ্গল গ্যালারি আছে না? ওখানে বার্লিন দেয়ালের একটি টুকরো এনে প্রদর্শনী করা হয়েছিল ২০১০ সালের ২৩ শে মে।

রেডিও ফ্রান্সের সামনে বসেছিল এরকম এক টুকরো। আরেকটি আছে প্যারিসের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া স্যিন নদীর পাড়ে। একটা মেট্রো স্টেশন আছে এর ঠিক উলটো দিকে। পরে জানলাম, আরো কয়েকটি টুকরোর কথা। এসপ্লানাদ দ্যু নফ্ নোভম, লা দেফঁস্, অজেঁ, ক্যায়ো, মার্সেই এবং স্ট্রাসবুর্গ নামের জায়গাগুলোতে।

রেডিও ফ্রান্সকে এই টুকরোটি নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন জার্মান রেডিও ডয়েচেল্যান্ড রেডিওর সে সময়কার প্রেসিডেন্ট উইলি স্টেউল। ২০০৯ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিখে টুকরোটি হাতে আসে। বার্লিন দেয়াল পতনের বিশতম বার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠান হচ্ছিল ঐ দিনই। শুভক্ষণ মনে করে ঐ দিনই টুকরোটি বসে গেল রেডিও ফ্রান্সের সবুজ চত্বরে।

দেয়ালের পেছনে যে সুন্দর আর্ট দেখলাম, তা করেছিলেন জার্মান শিল্পী কিডি কিটনি এবং ফ্রেঞ্চ সংগীতজ্ঞ তিয়েহি নোয়াহ্। ১৯৮৪ সালে করা আর্ট এটি। অনেকক্ষণ দেখলাম, কী এই আর্টের অর্থ, বুঝতে চাই। বুঝতে পারিনি। তবে রং নিয়ে আঁকাআঁকি কখনোই যুদ্ধবাজদের কাজ নয়, তা তো সবাই জানে। আর তাই দেয়ালের টুকরোটাকে ঘিরে থাকা সবুজ গাছগুলো মাথা নেড়ে নেড়ে আমাকে আর্টখানা বুঝিয়ে দিতে দিতে বলছিল, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।

বর্ষার ছন্দে ছন্দে

আবু আফজাল মোহা. সালেহ

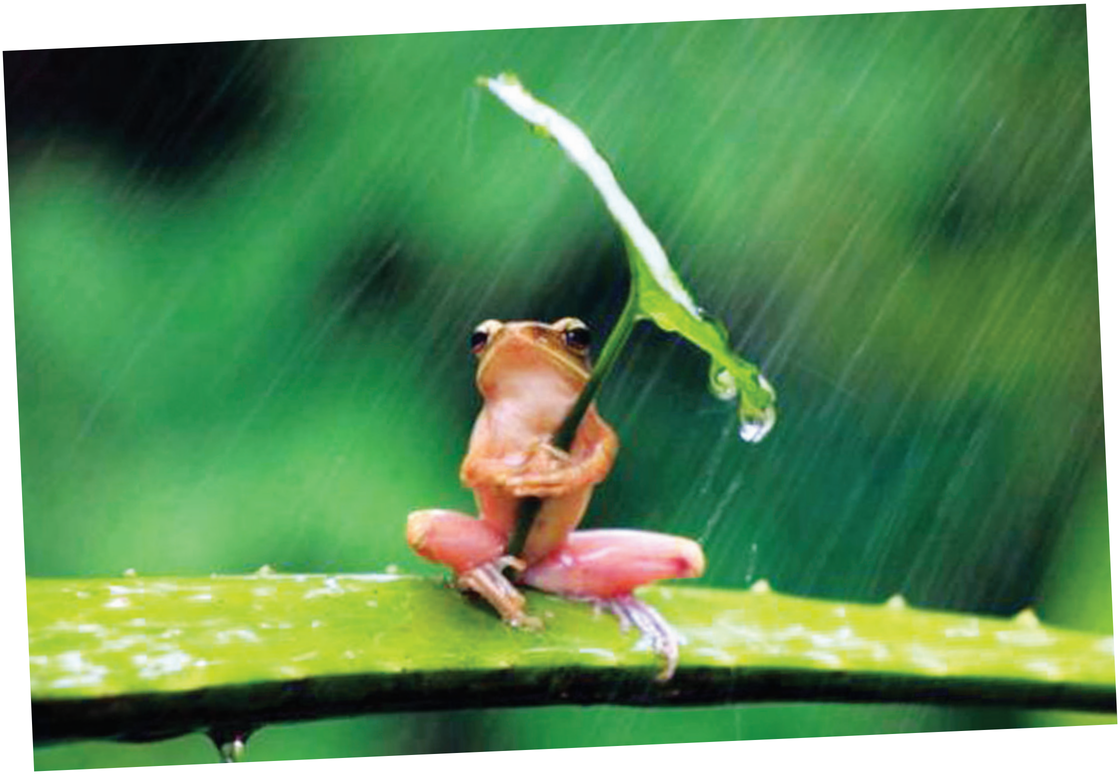

বৃষ্টির আবেদন চতুর্মুখী। বৃষ্টির অপরূপ দৃশ্য আমাদের মনে কুহক জাগায়। মায়াবি রূপ আমাদের মোহিত করে, আন্দোলিত করে শিহরিত করে। ঋতু পরিবর্তিত চিরায়ত ধারায় আষাঢ়-শ্রাবণ এ দুই মাসকে ঘিরে আমাদের বর্ষাকাল। বর্ষাকালে আকাশ থাকে গুরুগম্ভীর। কালো মেঘের অনবরত গর্জন, মেঘ বর্ষণের বিপুল দাপট চলে এ দুই মাসে। বাংলা সাহিত্যে ষড়ঋতুর প্রভাব বহুদূর-সঞ্চারি। বর্ষার চরিত্র বা সৌন্দর্যের যে বহুগামী বৈচিত্র্য তা অন্য পাঁচটি ঋতু থেকে স্বতন্ত্র। এ স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতুকে নিয়ে কবিদের কবিতায় বর্ষার রূপ বা সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে নানান অভিপ্রায়ে।

কবির মনে বর্ষার প্রভাব চমৎকার! বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঋতুভিত্তিক সাহিত্যে বর্ষা নিয়েই বেশি সাহিত্য রচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কাজী নজরুল বা পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন কিংবা তিরিশের কবিরাও বর্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রবি ঠাকুরের বর্ষায় ছন্দ জমে ওঠে। বৃষ্টির শব্দে ছড়ার ছন্দ জমাট বাঁধে। কবি হয়ে ওঠেন অনন্য। বহুপঠিত একটি ছড়া যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-

দিনের আলো নিবে এল/সুয্যি ডোবে-ডোবে। আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে, চাঁদের লোভে লোভে।

মেঘের উপর মেঘ করেছে/রঙের উপর রঙ,/মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা/ বাজল ঠঙ ঠঙ।/ ওপারেতে বৃষ্টি এল,/ ঝাপসা গাছপালা/এ পারেতে মেঘের মাথায়/একশ মানিক জ্বালা।/ বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে/ ছেলে বেলার গান/ বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর / নদে এল বান।’

...(বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রিয় ঋতু ছিল বর্ষা। বর্তমানকালের কবিরাও বর্ষায় প্রভাবিত। জীবনানন্দ যেমন হেমন্তে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন রবি ঠাকুর তেমনই বর্ষায় প্রভাবিত হয়েছেন। কারণও আছে। জমিদারি সূত্রে তিনি বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর, শাহজাদপুরে নদীপথে প্রায়ই আসতেন। বর্ষায় নদীতে নৈসর্গিক দৃশ্য সৃষ্টি হয়! বাঁকে বাঁকে রূপ বদলায় প্রকৃতি। এ কারণেই রবিসহ কবি-সাহিত্যিকগণ বর্ষায় প্রভাবিত বেশি হয়ে থাকেন।

'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে'- গাছে কদম ফুল আর বৃষ্টির পরশ। কেয়া বনে খেলা করে কেতকী। গরমের দাপট কমাতে বর্ষার আগমন। বৃষ্টির জল গায়ে নৃত্য করে পশুপাখি। তাই বলা যায়, বর্ষা কেবল ঋতুই নয়, বাঙালির সংস্কৃতির অংশও বটে! বর্ষার সতেজ বাতাসে জুঁই, কামিনী, দোলনচাঁপা, রজনীগন্ধা, বেলি, কদম-কেয়া আরো কত ফুলের সুবাস! পুকুরে রঙিন হয়ে ফোটে পদ্ম। কেয়ার বনে কেতকীর মাতামাতি, নাচানাচি, দুরন্ত বালক-বালিকার জলক্রীড়া! চমৎকার সব দৃশ্য ভাবুক ও সমৃদ্ধিশালী করে তোলে কবি মনকে। বর্ষায় বিভিন্ন রকম ফুল ফোটে। চারদিকে ফলের বাহার। নদী-খাল-বিলে পলিমাটি আর মাছে ভরপুর। এক মোহনীয় দৃশ্য সৃষ্টি হয় বর্ষাকালে। বিরহও জাগে। তাই তো কবি নজরুল বর্ষাতে বিরহের সাহিত্য রচনা করেছেন। নতুন প্রজন্মও রোমান্টিক ও বিরহের উভয় ক্ষেত্রে সাহিত্য রচনা করছেন। বিশেষ করে ছড়া-কবিতা।

কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা বর্ষা নিয়ে লিখেছেন :

বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে/মনে মনে বৃষ্টি পড়ে/বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে/বনে বনে বৃষ্টি পড়ে/মনের ঘরে চরের বনে/নিখিল নিঝুম গাও গেরামে/বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে/বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে।

ফররুখ আহমদকে বৃষ্টির ছন্দ নাচিয়েছে। মনে আনন্দের ঢেউ খেলিয়েছে। তিনি আনন্দে তবলার ছন্দের মতো 'বৃষ্টির গান'-এ গেঁথেছেন :

বৃষ্টি এলো কাশবনে/জাগলো সাড়া ঘাসবনে/
বকের সারি কোথায় রে/লুকিয়ে গেলো বাঁশবনে।

নদীতে নাই খেয়া যে/ডাকলো দূরে দেয়া যে/
কোন সে বনের আড়ালে/ফুটলো আবার কেয়া যে।

বৃষ্টি এলেই

শরীফ আব্দুল হাই

বৃষ্টি এলেই ভেজা কাকের ডানা
বৃষ্টি এলেই ভেজা বেড়াল ছানা।
বৃষ্টি এলেই টাপুর টুপুর টুপ
বৃষ্টি এলেই রয় না খুকু চুপ।
বৃষ্টি এলেই ছেলেরা সব মাঠে
বৃষ্টি এলেই খেলায় সময় কাটে।
বৃষ্টি এলেই বন্ধ দোকানপাট
বৃষ্টি এলেই ফাঁকা রাস্তাঘাট।
বৃষ্টি এলেই ভাঙে নদীর তীর
বৃষ্টি এলেই জীবন হয় অস্থির।

ওকি, ষষ্ঠ শ্রেণি, পাইকপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি

আবুল কালাম আজাদ

আগস্ট মাস। শোকের মাস।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল বিপথগামী কিছু সেনা অফিসার। নিষ্পাপ ছোট্ট শিশুটিও রক্ষা পায়নি ওদের পৈশাচিক মানসিকতা থেকে। ওদের অপকর্মে উচ্চ পদস্থ কোনো কোনো কর্মকর্তার যে সায় ছিল না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ওরা কুখ্যাত। ওরা ঘৃণিত। ওরা এই জাতিকে কলঙ্কিত করেছে। ওরা জাতিকে চিরদিনের জন্য শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে, ততদিন ওদের নাম উচ্চারিত হবে প্রবল ঘৃণার সাথে।

ওরা বঙ্গবন্ধুর শরীরটাতেই বুলেট বিদ্ধ করতে পেরেছে শুধু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অমর, অক্ষয়, অমলিন এক নাম। প্রতিটি বাঙালির রক্ত অণুতে এই নাম শ্রদ্ধার সাথে অনুরণিত হতেই থাকবে।

কথাগুলো বললেন বাবা। তারপর মুহিব চাচা বললেন, বঙ্গবন্ধু পেঁপে খেতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে অনেক পেঁপে গাছ ছিল। আর বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন কবুতর পুষতে। তাঁর অনেকগুলো কবুতর ছিল। তিনি শুয়ে থাকলে কবুতরগুলো তাঁর বুকের উপর হেঁটে বেড়াতো মাঝে মাঝে।

মুহিব চাচা আরো বললেন, ১৫ই আগস্ট। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর জানলাম। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বের হয়ে গিয়েছিলাম বাসা থেকে। বিপজ্জনক জেনেও ৩২ নম্বর বাড়ির দিকে আমি হেঁটে গিয়েছিলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু প্রতিবাদ আমার চোখে পড়েছিল। এক পর্যায়ে আমি ৩২ নম্বর বাড়িতে ঢুকেও ছিলাম। দেখেছিলাম তাঁর প্রিয় কবুতরগুলোকে। বিক্ষিপ্তভাবে হাঁটাহাঁটি করছে। আমি বুঝেছিলাম, ওরা আমার চেয়েও বেশি শোকাহত! মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের স্বার্থপরতা, মানুষের হিংস্রতা ওদেরকেও স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ওরা বাক বাকুম ডাক ভুলে গিয়েছিল যেন। যারা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে হত্যা করেছে, তাদের জন্য থাকবে আমাদের চিরকালীন অভিশাপ।

আমরা বিষণ্ণ। পিতৃ হারানোর শোক আমাদের চোখে-মুখে ও বুকের গহনে। আমরা কিছু বলতে পারছিলাম না।

বড়ো চাচা বললেন, আমাদের আসর যথারীতি চলবে। আমরা বলব ও শুনব ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের গল্প।

সে গল্পে যাবার আগে আমরা আমাদের জাতির পিতার স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করব।

> **‘তাঁর অনেকগুলো কবুতর ছিল। তিনি শুয়ে থাকলে কবুতরগুলো তাঁর বুকের উপর হেঁটে বেড়াত মাঝে মাঝে’**

আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল, এটা হবে প্রশ্নোত্তর আসর। আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, আমরা উত্তর দিব। বড়ো চাচা ঠিক করে দিলেন, চারটার বেশি প্রশ্ন কেউ করতে পারবে না। আর প্রশ্নের জন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার হলে সে ব্যখ্যা দিতে হবে। এটা আমাদের জানার স্বার্থে।

বড়ো চাচা, মুহিব চাচা, বাবা, মা এবং ছোটো চাচা সবাই তাদের প্রশ্ন কাগজে লিখে রেখেছেন। কারণ, প্রশ্ন করার সময় ভাবতে গেলে সময় খরচ হবে।

প্রথমে প্রশ্ন করবেন মুহিব চাচা। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের ২ তারিখে টাইম ম্যাগাজিনের একটা প্রতিবেদনে শরণার্থী সম্পর্কে কী বলেছিল, কেউ কি জানো?

প্রশ্নটার উত্তর আমার জানা। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘নদী পেরিয়ে, মহাসড়ক ধরে, অসংখ্য বনবাদাড় মাড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য মানুষ ভারতে এসে ঢুকেছে। সে এক বিপুল জনস্রোত। কার্ডবোর্ডের বাক্স, টিনের কেটলি হাতে, ছেঁড়া কাপড়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙালি উদ্‌বাস্তু। কেউ বইছে রোগা শিশুদের, কেউ বা দুর্বল বৃদ্ধদের। নগ্ন পা তাদের ক্ষয়ে গেছে কাদায়। বাচ্চাদের বিচ্ছিন্ন কান্না ছাড়া তারা নিস্তব্ধ। কিন্তু তাদের চেহারাই বর্ণনা করছে ঘটনা। বেশিরভাগই তারা অসুস্থ। কাঁথায় ঢাকা। অনেকে কলেরায় আক্রান্ত। পথে মারা গেলে বইবার কেউ নেই। হিন্দুরা যখন পারছে মরার মুখে গুঁজে দিচ্ছে জ্বলন্ত কয়লা। দাহ করিয়ে দিচ্ছে কোনোমতে। বাকিটুকু সারছে শেয়াল, কুকুর আর কাক। মৃতদেহগুলো টপকে আসার সময় শরণার্থীরা নাকে কাপড় গুঁজে দিচ্ছে।

কথাগুলো আমার কাছে লেখা ছিল ডায়েরিতে। ডায়েরি দেখে পড়ার সময় আমার কণ্ঠে আবেগ চলে এসেছিল। সবাই মনের চোখে দেখতে পাচ্ছিল, শরণার্থীদের সেই কষ্ট।

মুহিব চাচা বললেন, তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে। এই প্রতিবেদনটুকু থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ, কীভাবে ছিন্নমূল মানুষেরা বাস্তভিটা ফেলে জীবন বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল ওপারে।

আমার পরের প্রশ্ন—কত তারিখে, ঢাকায় কত নম্বর সামরিক আদেশ জারি করে কত নম্বর সামরিক সেক্টর গঠন করে?

শিলা আপার বন্ধু মিনু আপা বলল, ১৯৭১ সালে ৪ঠা আগস্ট তারিখে ১৬২ নম্বর সামরিক আদেশ জারি করে ৬ নম্বর সামরিক সেক্টর গঠন করে।

মুহিব চাচা মৃদু হাসলেন। বললেন, বাহ! তোমরা তো একেবারে খুঁটিনাটি পড়ে ফেলেছো দেখছি। মনে হচ্ছে তোমরা সব প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারবে। বলো তো মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল কোন দল?

এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের সবারই জানা। আমার বন্ধু রাশেদ বলল-ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জামায়াতে ইসলামী।

তখন পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমির কে ছিল?

কুখ্যাত গোলাম আযম।

আগস্টের ৭ তারিখে কুষ্টিয়ার শান্তি কমিটির এক সভায় কুখ্যাত গোলাম আযম কী বলেছিল?

রাশেদ খাতা খুলল। ওর খাতার প্রথম দিকেই ছিল এই প্রশ্নের উত্তর। রাশেদ বলল, কুখ্যাত কূপমণ্ডূক ধর্মান্ধ গোলাম আযম বলেছিল, আওয়ামী লীগ ও এর প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। শেখ মুজিব ও তাঁর ভাবপন্থি আওয়ামী লীগ সদস্যদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানরা যথাসময়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে জনগণের দুর্ভোগের সীমা থাকত না। গোলাম আযম মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার এবং রাষ্ট্রবিরোধীদের দমনে শান্তি কমিটি, রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য জামায়াত কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানায়।

মুহিব চাচা বললেন, তোমরা যে পুঙ্খানুপুঙ্খ নোট টুকে রেখেছো এটা অনেক ভালো ব্যাপার। সত্যি কথা হলো, তখন পাকিস্তানি জঙ্গি সরকার আর তার দোসরদের মূল কাজ ছিল ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো। তারা জনগণকে বোঝাতে চাইত ভারত আর হিন্দু তাদের বিরোধী। বাস্তবিক ওদের মতো কূপমণ্ডূক ধর্মান্ধ ছাড়া দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিক ওদেরকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত। তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করতে কুণ্ঠাবোধ করত না। মিথ্যা যে কখনো জয়ী হয় না, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েই সেটা প্রমাণ করেছে।

এবার বড়ো চাচার পালা। বড়ো চাচা বললেন, আমার মনে হচ্ছে, তোমরা প্রায় সব প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারবে। তবুও আসরের প্রয়োজনে আমিও দু/একটা প্রশ্ন করব। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও অন্যান্য অভিযোগে বিশেষ সামরিক আদালতে বেআইনি ঘোষিত আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে। আগামী ১১ই আগস্ট বিচার শুরু হবে। বিচারের বিবরণ গোপন রাখা হবে। অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থন ও আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে আইনজীবীকে পাকিস্তানি নাগরিক হতে হবে। তোমরা বলবে, এই ঘোষণাটা আগস্টের কত তারিখে হয়েছিল?

আমাদের দুই ক্লাশ নিচের রিপন ঝট করে দাঁড়িয়ে চট করে বলে দিল, ৯ই আগস্ট, ১৯৭১।

ওর বলার ভঙ্গিতে আমরা সবাই হেসে দিলাম। বড়ো চাচা বড়ো চোখ করে তাকালেন ওর দিকে। অস্ফুট স্বরে বললেন, বাপরে...!

বড়ো চাচা বললেন, আচ্ছা বলো তো, তখন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কে ছিলেন?

আমার বন্ধু পিপলু বলল, তখন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন উইলিয়াম রজার্স আর মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন জর্জ বুশ।

উত্তর সঠিক হয়েছে। ১৯৭১ সালে ১০ই আগস্ট এই দুই ব্যক্তি পাকিস্তান-ভারত পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে মহাসচিব উ থান্টের সঙ্গে চার ঘন্টাব্যাপী বৈঠক করেন। আচ্ছা, এখানে কুমিল্লা অঞ্চলের কে আছ?

আহনাফ হাসান চৌধুরী, নবম শ্রেণি, সরকারি জুবিলী হাই স্কুল, সুনামগঞ্জ

দাঁড়ালো চারজন। বড়ো চাচা বললেন, ১১ই আগস্ট তারিখে মুক্তিযোদ্ধারা কুমিল্লায় একটা বড়ো সাফল্য পায়। সে সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারবে?

চারজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর শিলা আপার বন্ধু মিনু আপা তাদের বন্ধু শফি ভাইকে চোখ ইশারায় বলল, তুমি বলো। তার মানে দু'জনই উত্তরটা জানে।

শফি ভাইয়া বলল, মেজর সালেকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা সড়কে রসূল গ্রামের কাছে একটি রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করে। এ আক্রমণে ২০জন রাজাকার নিহত ও ৩০জন বন্দি হয়। আক্রমণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা নিরাপদে নিজ অবস্থানে ফিরে আসে।

এই ১১ই আগস্ট তারিখেই গুরুত্বপূর্ণ একটা গেরিলা হামলা ঘটে ঢাকায়। এই হামলা সম্পর্কে কে বলবে?

মিনু আপা বলল, মুক্তিবাহিনীর দুঃসাহসী গেরিলা যোদ্ধারা ঢাকার বিলাসবহুল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে টাইম বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আমেরিকার টাইমস পত্রিকার সাংবাদিকসহ ২০জন পাকিস্তানি সেনা গুরুতর আহত হয়।

চা বিরতির পর বাবা বললেন, বড়ো ভাইয়া যখন একটা পাকিস্তানি জাহাজ ধ্বংসের ঘটনা বললেন, তাহলে আমিও আরেকটা বলি।

বাবা বলবেন। তার মানে প্রশ্ন করবেন না। আমরা স্বস্তি পেলাম। আর মুক্তিযোদ্ধাদের এরকম বিজয়ের ঘটনা শুনতে আমাদের ভালো লাগে।

বাবা বললেন, ১৯৭১ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখ। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে এমভি হরমুজ ৯৯১০ মেট্রিক টন সমর-সম্ভার, এমভি আল আব্বাস ১০৪১০ টন সামরিক সরঞ্জাম এবং ওরিয়েন্ট বার্জ ২৭৬ টন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ১২ ও ১৩ নং মংলা বন্দর জেটিতে অবস্থান করে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা জাহাজ তিনটিতে লিমপেন্ট মাইন লাগিয়ে নিঃশব্দে ভাটিতে ভেসে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। একের পর এক মাইন বিস্ফোরণ হতে থাকে। জাহাজ তিনটিসহ পার্শ্ববর্তী অনেক জাহাজ বিধ্বস্ত হয় এবং পানিতে ডুবে যায়।

খুবই রোমাঞ্চকর ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা। মুক্তিযোদ্ধারা এরকম দেশপ্রেমিক, দুঃসাহসী ও কৌশলী ছিলেন বলেই তারা সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত বিশাল এক পেশাদার বাহিনীকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন।

তারপর বাবা বললেন, একজন বীরশ্রেষ্ঠ আছেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। নাম কী তার?

আমার ছোটো বোন নুপুর হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান।

মুহিব চাচা হাততালি দিয়ে উঠলেন।

বাবা বললেন, গুড। তাঁর সম্পর্কে তুমি তো পড়েছো, তাই না?

জি বাবা।

তাহলে তুমি কিছু বলো তাঁর সম্পর্কে।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ছিলেন করাচির মাসরুর বিমান ঘাঁটির ইনস্ট্রাক্টর ফ্লাইয়ার। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে মনস্থির করেন। ১৯৭১ সালের ২০শে আগস্ট তারিখ। তিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর টি-৩৩ বিমানে করে মুজিবনগর আসার সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ২৯শে নভেম্বর ১৯৪২ সালে ঢাকার রায়পুরা থানার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন কে করবেন? ছোটো চাচা বললেন, তোমরা কি জানো, পূর্ব পাকিস্তান সামরিক সরকার আনসার অধ্যাদেশ-১৯৪৮ বাতিল করে রাজাকার আদেশ ১৯৭১ সালের কোন তারিখে জারি করে কবে?

এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা কেউ দিতে পারলাম না।

একটু অপেক্ষায় থেকে ছোটো চাচা বললেন, ঠিক আছে, শতভাগ প্রশ্নের উত্তর কেউই দিতে পারে না। আমি বলে দিচ্ছি, এই অধ্যাদেশ জারি করে ১৯৭১ সালের ২১শে আগস্ট।

ছোটো চাচার পরের প্রশ্ন-কোন তারিখে বাংলাদেশের কোন অঞ্চল প্রথম শত্রুমুক্ত হয়ে বেসামরিক প্রশাসন চালু করে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল শিলা আপা। শিলা আপা বলল, ২৮শে আগস্ট সিলেটের জগন্নাথপুর থানার দিরাই ও শাল্লা এলাকা শত্রুমুক্ত হয় এবং সেখানে বেসামরিক প্রশাসন চালু হয়।

ছোটো চাচা বললেন, উত্তর সঠিক হয়েছে। আমি আর কোনো প্রশ্ন করবো না। আমার মনে হয়, তোমাদেরকে আমরা অনেক প্রশ্নই করেছি। আর প্রয়োজন নেই। এখন আজকের আসরের সমাপনীতে চলে যাওয়া যেতে পারে। সমাপনী কথা কে বলবে?

শহিদ রুমী

শহিদ জুয়েল

শহিদ আলতাফ মাহমুদ

শহিদ বকর

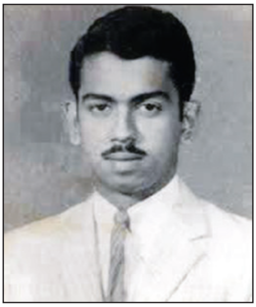
শহিদ আজাদ

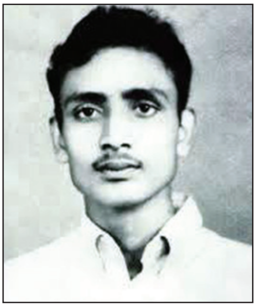
শহিদ বদি

শহিদ হাফিজ

মুহিব চাচা মা-কে অনুষ্ঠানের ইতি টানতে বললেন। বললেন, তোমার কাছ থেকেই আমি এই প্রশ্ন-উত্তর পর্বের আইডিয়া পেয়েছিলাম। তুমিই শেষ করো।

মা বললেন, ইতিপূর্বে তোমরা গেরিলা যোদ্ধা রুমীর কথা শুনছো। ২৯শে আগস্ট তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী আকস্মিকভাবে রুমীদের এলিফ্যান্ট রোডের ৩৫৫ নম্বর কনিকা বাড়িটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সেখান থেকে রুমী, ওর বাবা শরীফ এবং ওর ছোটো ভাই জামীকে ধরে নিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের খবর বের করতে ওদের ওপর চালায় অকথ্য নির্যাতন। শরীফ আর জামী ফিরে এলেও রুমী আর কোনোদিন ফিরে আসেনি।

রুমীর কথা আমরা অনেকবার শুনেছি। দেশপ্রেমিক যুবক। আমেরিকায় পড়তে না গিয়ে দেশের প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধে যায়। আমরা চুপ করে রইলাম।

একটু থেমে মা বললেন, আর ৩০শে আগস্ট কয়েকজন সহযোদ্ধার সাথে নিজ বাসভবনে ধরা পড়ে আরেক গেরিলা যোদ্ধা আজাদ। তার পুরো নাম মাগফার আহমেদ আজাদ। সে শহিদ আজাদ নামেই সমাধিক পরিচিত। সে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন গেরিলা যোদ্ধা। ২নং সেক্টরের বিখ্যাত আরবান গেরিলা দল ক্র্যাক প্লাটুনের একজন সদস্য ছিল।

আমার বন্ধু পিপলু বলল, কাকিমা, ক্র্যাক প্লাটুন কী?

সুন্দর প্রশ্ন। সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের নির্দেশনা ছিল, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিদেশি সংবাদিক ও অতিথিরা থাকাকালীন ঢাকা শহরের আশপাশে কিছু গ্রেনেড ও গুলি ছুঁড়তে হবে। শহরের পরিস্থিতি যে শান্ত নয় এবং যুদ্ধ চলছে তা বোঝানোই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃসাহসী তরুণেরা ঢাকায় এসে ৯ই জুন তারিখে সরাসরি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড হামলা করে। এটা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। সন্ধ্যায় বিবিসির খবর থেকে খালেদ মোশাররফ এই অপারেশনের কথা জানতে পেরে বলেন-‘দিজ অল আর ক্র্যাক পিপল। বললাম ঢাকার বাইরে বিস্ফোরণ ঘটাতে আর ওরা একেবারে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এল।’ তিনিই সর্বপ্রথম এই দলটিকে ক্র্যাক আখ্যা দেন। যা থেকে পরবর্তীতে ক্র্যাক প্লাটুন নামে পরিচিতি পায়। খালেদ মোশাররফ ছাড়াও এই দলটি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এটিএম হায়দারের।

যা বলছিলাম, রুমীর মতো আজাদও ছিল ধনীর দুলাল। আজাদ সবসময়ই ছিল স্বাধীনচেতা তরুণ। ছিল দুরন্ত গান পাগল। বই পড়ুয়া। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে এমএ পাস করে। দেশমাতৃকার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। পাকিস্তানি আর্মিদের হাতে ধরা পড়ার পর মুক্তিবাহিনীর তথ্য নেওয়ার জন্য তার ওপর চালানো হয় অকথ্য নির্যাতন। সব নির্যাতন সহ্য করে গেছে, কিন্তু মুখ খোলেনি। তার মা যখন বন্দি অবস্থায় তাকে দেখতে যান, তখন সে মায়ের কাছে ভাত খেতে চেয়েছিলেন। পরদিন মা ছেলের জন্য ভাত নিয়ে গিয়ে ছেলেকে আর পাননি। তারপর দীর্ঘ ১৪ বছর আজাদের মা সাফিয়া বেগম ভাত খাননি। ছেলেকে শক্ত মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন তিনি। বাকি জীবন তিনি বিছানায়ও ঘুমাননি।

মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। আমাদের সবার চোখও ভেজা। গলার কাছে আটকে আছে কান্না।

ধরা গলায় মা বললেন, এইসব ছেলেরা জীবনের মায়া উপেক্ষা করে আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে গেছে। দুঃখের বিষয় হলো, এই দেশে এখনো এমন অনেক মানুষ আছে যারা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দিতে চায় না। এখনো এই দেশে স্বাধীনতা বিরোধী সেইসব শকুনদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবার মানুষ দেখা যায়। যারা পরাধীন আছে তারাই জানে পরাধীনতা কতটা কষ্টের। আমরা স্মরণ করতে পারি ফিলিস্তিনির কথা। প্রতি মুহূর্তে ফিলিস্তিনির মানুষদের বেঁচে থাকতে হয় মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়ে। নিজের দেশেই তারা পরবাসী, উদ্‌বাস্তু। যা বলছিলাম, মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আজাদ ও তার মায়ের জীবনের সত্য ঘটনা নিয়ে আনিসুল হক লিখেছেন উপন্যাস-মা। উপন্যাসটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়, পাঠকপ্রিয়তাও পায়। ফ্রিডম'স মাদার নামে এটি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে। লা মাদ্রে নামে অনূদিত হয়েছে স্পেনীয় ভাষায়।

শীলা আপার বন্ধু নেহাল ভাইয়া বলল, কাকিমা, আমরা সেই ক্র্যাক প্লাটুন গ্রুপের সদস্য ছিল এমন আরও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নাম জানতে চাই।

খুব ভালো কথা। সেই ক্র্যাক প্লাটুন আরবান গেরিলা দলের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আজম খান- তোমরা যাকে পপগুরু হিসেবে জানো। আরো ছিলেন আবুল বারাক আলভী, চুল্লু, জহির উদ্দিন জালাল, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, নীলু, পুলু, বদিউজ্জামান, বদিউল আলম বদি, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ, কণ্ঠ শিল্পী লিনু বিল্লাহ, হিউবার্ট রোজারিও, হ্যাসিরসহ আরো বেশ কয়েকজন। ক্র্যাক প্লাটুনের কমান্ডার ছিলেন কামাল উদ্দিন আহমেদ।

তারপর উপহার দেবার পালা। কথা ছিল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরস্কার থাকবে। সেই সাথে থাকবে অনুপ্রেরণা পুরস্কার। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। কেউ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নয়। সবাই সমান। সবার জন্যই একই প্যাকেট। তার ভেতর আছে মহামূল্যবান বই। কয়েকটা বইয়ের সাথে আছে আনিসুল হকের 'মা' উপন্যাসটিও। এ কথা জানতে পেরে আমরা খুব খুশি হলাম।

চা-নাস্তা শেষে সুন্দরভাবে শেষ হলো আমাদের আগস্ট মাসের আসর। অপেক্ষা সেপ্টেম্বরের জন্য।

জাতির পিতা

নিপু শাহাদাত

পদ্ম- মেঘনা- ব্রহ্মপুত্র
যমুনা-সুরমা বহে
বীর বাঙালি হাজার বছর
নানান দুঃখ সহে।
দুঃখ সয়ে- শোষণ জয়ে
দাঁড়ায় মাথা তুলে
ইতিহাসের সত্য ভাষণ
ভুলব কেমন করে?
অবহেলা-নির্যাতনের
করেন অবসান
বাংলাদেশের মহান নেতা
মুজিবুর রহমান।
তিনিই আমার জাতির পিতা
মহান মুজিবুর
দুঃখ-জয়ে আর নির্ভয়ে
আছেন যে ভাস্বর।

ভিনদেশি ভাষার গল্প

দাদু বাড়িতে

মূল : নিকোলাই নসোভ

ভাষান্তর : আবুল বাসার

লেখক পরিচিতি

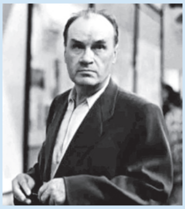

জনপ্রিয় রুশ শিশুসাহিত্যিক, রম্য ছোটো গল্পকার ও ঔপন্যাসিক নিকোলাই নসোভের পুরো নাম নিকোলাই নিকোলাইভিচ নসোভ (১৯০৮-১৯৭৬)। তিনি রাশিয়ার কিয়েভ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে *জলি ফ্যামিলি*, *দ্য কোলিয়া সিনিটসিনস ডায়েরি*, *ভিটিয়া মালিভ অ্যাট স্কুল অ্যান্ড অ্যাট হোম*, *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব ডান্নো অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস* ইত্যাদি।]

গত গ্রীষ্মে সুরিক আর আমি দাদুকে দেখতে গিয়েছিলাম। সুরিক আমার ছোটো ভাই। আমার বয়স সাত। আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি, কিন্তু সুরিক এখনো স্কুলে যায় না। এমনকি সে আমাকে খুব একটা পাত্তাও দেয় না। তাতে অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না। আমরা দাদুর বাড়ি পৌঁছেই উঠোন, বারান্দা আর ছাদের কুঠুরিতে তন্নতন্ন করে খোঁজখবর শুরু করলাম।

প্রথমেই একটা খালি জ্যামের শিশি আর একটা জুতা পালিশের বাক্স পেয়ে গেলাম আমি। আর সুরিক পেল একটা পুরাতন দরজার হাতল আর একটা রাবারের গামবুট। এরপর চিলেকুঠুরিতে পাওয়া একটা মাছ ধরা বড়শির জন্য আমাদের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ লেগে গেল। ওটা কিন্তু আমিই প্রথমে দেখতে পেয়েছিলাম। তাই বললাম, ওটা আমার!

সুরিকও জিনিসটা দেখে বলল, এটা আমার!

বড়শিটার একপ্রান্ত আমি আর একপ্রান্ত সুরিক খামচে ধরল। এরপর দুজনেই গায়ের সব শক্তি দিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলাম। ওটা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাচ্ছিলাম না। তাই পাগলের মতো বড়শিটা চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলাম। তাতে টাল সামলাতে না পেরে সুরিক পিছনে ধপাস করে পড়ে গেল। তারপর বলল, নাও গে যাও! বড়শি দিয়ে কী হবে? এই দেখো আমার রাবারের গামবুট আছে।

আমি বললাম, তুই গিয়ে তোর গামবুটে যত খুশি চুমু খা। কিন্তু খবদ্দার আমার বড়শিতে হাত দিবি না।

বারান্দায় একটা কোদাল পেলাম। মাছ ধরব ভেবে সেটা দিয়ে মাটি খুঁড়ে কেঁচো ধরতে গেলাম। আর সুরিক দাদির কাছে ম্যাচ চাইল।

দাদি বলল, ম্যাচ দিয়ে কী করবি?

সুরিক বলল, উঠোনে আগুন ধরাব। তারপর এ গামবুট আগুনের উপর রাখব। গামবুটটা গলে গেলে বুঝব এটা রাবারের।

দাদি বললেন, তারপর কী হবে ভেবে দেখেছিস! তুই বাড়িটা আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেল, আর আমি চেয়ে চেয়ে তা দেখি। না সোনা, ম্যাচ চেয়ো না। বাচ্চাদের ম্যাচ নিয়ে খেলতে নেই। চিন্তা করে দেখ, তাতে কত ক্ষতি হবে!

দাদির কাছে সুবিধা করতে না পেরে সুরিক দরজার হাতল আর গামবুট একটা দড়ির দুই প্রান্তে বাঁধল। এরপর হাতল ধরে গামবুটটা উঠোনের এপাশ থেকে ওপাশে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। এভাবে আমার কাছে এসে সে আমাকে মাটি খুঁড়ে কেঁচো বের করতে দেখে বলল, শুধু সময় নষ্ট করছো। তুমি কোনো মাছই ধরতে পারবে না।

কেন, পারব না কেন?

কারণ আমি মন্ত্র পড়ে সব মাছ তাড়িয়ে দেব।

বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘মিছিমিছি ভয় দেখাস না।

মাটি খুঁড়ে বেশ কিছু কেঁচো বের করে সেগুলো একটা বাক্সে ভরে পুকুরের দিকে গেলাম। বাড়ির ঠিক পেছনেই পুকুর। এরপরই খামারের বাগান শুরু হয়েছে। বড়শির সাথে কেঁচো গেঁথে পুকুরে ছুঁড়ে দিলাম। পুকুরপাড়ে বসে বড়শিতে মাছ বাঁধার অপেক্ষা করলাম। সুরিক হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে এল। হঠাৎ করে সে মাছ তাড়ানোর মন্ত্র আওড়াতে

লাগল, বাঁচুক আর মরুক আমি ওর হাড় গুঁড়ো করে রুটি বানাব!

ভাবলাম, কিছু বলব না। কারণ জানতাম, কিছু বললে তো কাজ হবেই না, উলটো ওর চিৎকার-চেঁচামেচি বাড়বে। একটানা চিৎকার করতে করতে সুরিক এক সময় ক্লান্ত হয়ে গেল। তারপর কোনো কাজ না পেয়ে সে সুতোয় বাঁধা গামবুটটা পুকুরের পানিতে ছুঁড়ে মারল। তারপর ঢিল ছুঁড়ে সেটাকে ডোবাতে চেষ্টা করল।

প্রচণ্ড রাগে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না আমি। তারপর চেঁচিয়ে বললাম, এখান থেকে যা! তুই সব মাছকে ভয় দেখাচ্ছিস!

তুমি কিছুই ধরতে পারবে না। আমি সব মাছ তাড়িয়ে দিয়েছি। এ কথা বলে সে গামবুটটা পুকুরের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলল।

আমি লাফিয়ে উঠে একটা লাঠি যোগাড় করলাম। সুরিক ভোঁ-দৌড় দিল। গামবুটটা পুকুর ছেড়ে তার পেছন পেছন নাচতে নাচতে চলে গেল। ওর ভাগ্য ভালো বলতে হবে, ওকে ধরতে পারলাম না।

পুকুরে ফিরে আবার মাছ ধরতে বসলাম। সূর্য তখন মাথার ওপর। কিন্তু একটা মাছও ধরতে পারলাম না। মাছেদের যে কী হলো বুঝতে পারছিলাম না। আমার সব রাগ গিয়ে পড়ল সুরিকের ওপর। একবার ভাবলাম, ওকে পিটিয়ে পিঠের ছালচামড়া তুলে দিই। মাছ ছাড়া বাসায় ফিরলে নির্ঘাত ও হাসাহাসি করবে। অন্তত একটা মাছ ধরার জন্য সবকিছুই করলাম। পুকুরের মাঝখানে বড়শি ফেললাম, পুকুরের কিনারায় ফেললাম। কিন্তু কোনো কিছুতেই লাভ হলো না। উপায় না দেখে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাছাড়া ভীষণ ক্ষুধায় পেটে ছুঁচো নাচছিল।

ফিরতি পথে বাড়ির গেটে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ পেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম সুরিক কুড়িয়ে পাওয়া দরজার হাতলটা পেরেক দিয়ে গেটে লাগানোর চেষ্টা করছে। বুঝলাম না ও হাতুড়ি আর পেরেক কোথায় পেল। ধমকের সুরে ওকে বললাম, এখানে পেরেক লাগাচ্ছিস কেন?

আমাকে দেখে সে মনে হয় একটু খুশি হলো। হি হি করে হাসতে হাসতে সে বলল, মাছ শিকারি তাহলে ফিরে এল! দেখি কী মাছ ধরেছ?

উত্তর না দিয়ে বললাম, তুই গেটে হাতল লাগাচ্ছিস কেন? একটা হাতল তো আছেই।

তাতে কী? এখন গেটে দুটো হাতল হলো। যদি একটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আরেকটা কাজে লাগবে।

হাতলটা গেটে লাগানোর পর একটা পেরেক বেঁচে গেল। সেটা দিয়ে সে কী করবে বুঝতে পারল না। তারপরই তার মাথায় বোধ হয় আরেকটা বুদ্ধি এল। বাকি পেরেকটা দিয়ে গামবুটটা গেটে লাগাতে লাগল।

এটা গেটে লাগাচ্ছিস কেন?

এমনি।

গাধা কোথাকার!

কিছুক্ষণ পরই দুপুরের খাবার খেতে দাদুকে বাড়ির দিকে আসতে দেখলাম। সুরিক ভয় পেল। সে গামবুট গেট থেকে খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু জিনিসটা বেশ শক্তভাবে লেগে গেছে। উপায় না পেয়ে সে গামবুটটাকে আড়াল করে গেটের সামনে দাঁড়াল।

দাদু এগিয়ে এসে বললেন, কী খবর তোদের! প্রথমদিনই দেখছি কাজ শুরু করে দিয়েছিস। গেটে আরেকটা হাতল লাগানোর বুদ্ধিটা কার?

সুরিকের। আমি জবাব দিলাম।

দাদু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, ভালো! এখন তাহলে আমাদের গেটে দুটো হাতল। একটা লম্বা মানুষদের জন্য, আরেকটা বেঁটে মানুষদের জন্য। তারপরই তিনি গেটে গামবুট দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কী জন্য?

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। ওদিকে সুরিক লাল হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না কী জবাব দেবে।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী চিঠির বাক্স? ডাকপিয়ন এসে কাউকে খুঁজে না পেলে এখানে চিঠি রেখে যেতে পারবে। সুন্দর বুদ্ধি তো।

আমি তাই ভেবেই বানিয়েছি।

সত্যি?

সত্যি বলছি।

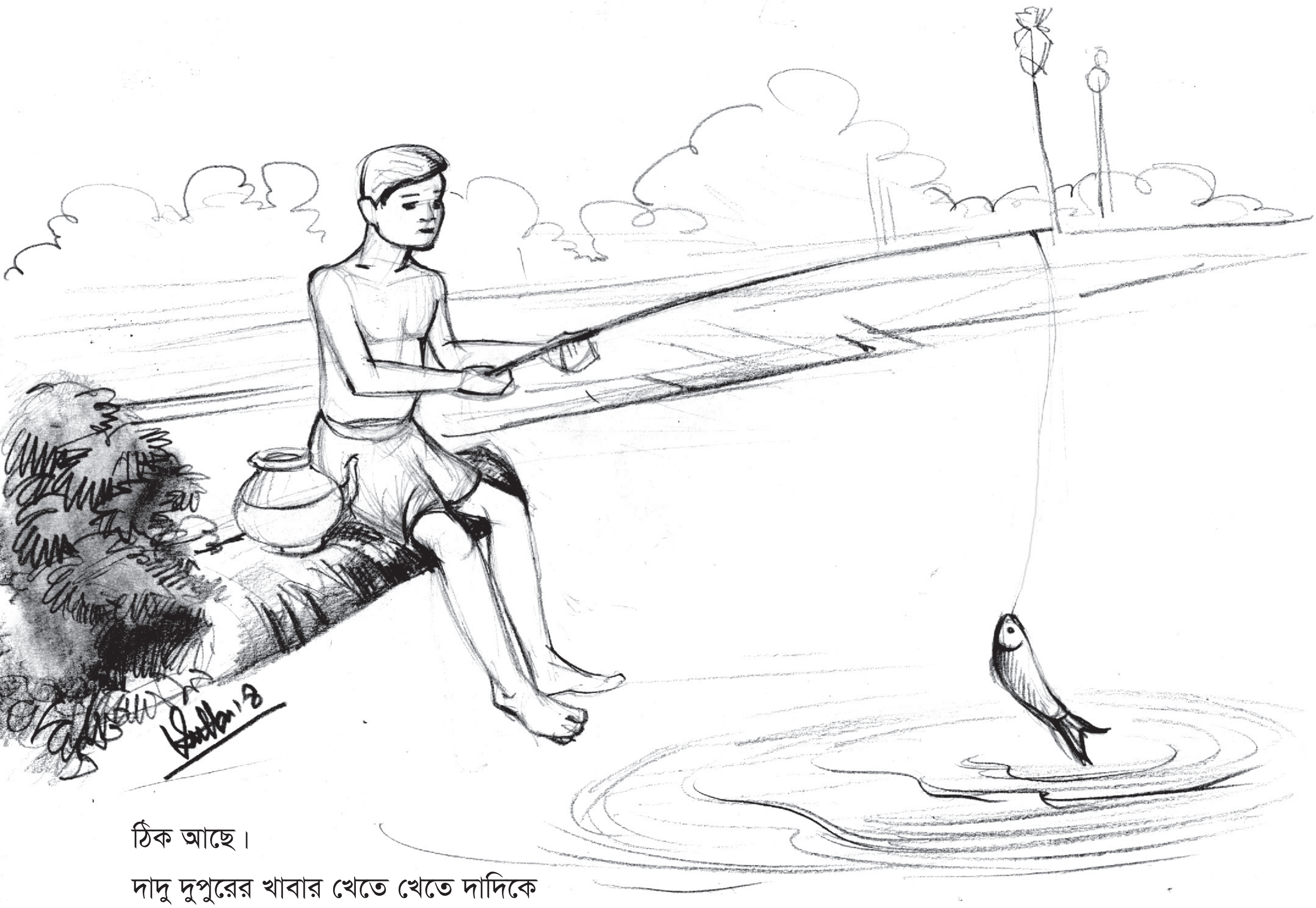

ঠিক আছে।

দাদু দুপুরের খাবার খেতে খেতে দাদিকে বললেন, সুরিক কত বুদ্ধিমান একটা ছেলে।

সত্যিই ব্যাপারটা বেশ লেগেছে। আমাদের মাথায় কখনো এই বুদ্ধিটা আসেনি। সুরিক গেটে একটা গামবুট লাগিয়েছে! অনেকবার ভেবেছি গেটে একটা ডাকবাক্স লাগানো দরকার। কিন্তু কখনো কাজটা করতে পারিনি। দাদু বললেন।

দাদি বললেন, আমি এরকম একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। একটা ডাকবাক্স আনা যাবে। ততদিনে গামবুটটা দিয়ে বেশ কাজ চলে যাবে।

দুপুরে খাওয়ার পর সুরিক ফলের বাগানে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। দাদু আমাকে ডেকে বললেন, আজ সকালে সুরিক বেশ কাজ করেছে। আমার ধারণা, তুমি কিছু না কিছু করার চেষ্টা করেছ, কোলিয়া। কী করেছো, সেটা স্বীকার করে তোমার দাদুকে একটু খুশি করো তো।

আমি মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু একটাও ধরতে পারিনি।

মাছ ধরতে কোথায় গিয়েছিলে?

পুকুরে।

ও আচ্ছা। তাই ভেবেছিলাম। পুকুরটা মাত্র কয়েকদিন আগে খোঁড়া হয়েছে। ওখানে একটা ব্যাঙও আছে কিনা সন্দেহ। কী করতে হবে শোনো, বড়শি নিয়ে নদীতে চলে যাও। কাঠের ব্রিজের কাছে স্রোত একটু বেশি। ওখানে বসে মাছ ধরো। তারপর দাদু কাজে বেরোলেন।

বড়শি হাতে নিয়ে আবারও মাছ ধরতে বের হলাম আমি। সুরিকের সাথে দেখা হতে বললাম, চল, নদীতে মাছ ধরি।

তুমি আমাকে হাত করার চেষ্টা করছ, ঠিক না?

কী কারণে?

যাতে আমি মাছ তাড়িয়ে না দিই।

ওতে আমার কিছু যায় আসে না।

কেঁচোর বাক্স আর জ্যামের খালি বোতল হাতে নিয়ে মাছ ধরতে নদীর দিকে রওয়ানা হলাম। সুরিক পিছু পিছু আসতে লাগল। নদীর কাছে পৌঁছে ব্রিজের পাশে একটা সুন্দর জায়গা দেখতে পেলাম। সেখানে গিয়ে নদীতে বড়শি ফেললাম। সুরিক আমার কাছে বসে বিড়বিড় করে ছড়া কাটতে লাগল বাঁচুক আর মরুক আমি ওর হাড় গুঁড়ো করে রুটি বানাবো!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে, তারপর আবার বলতে শুরু করল : বাঁচুক আর মরুক আমি ওর হাড় গুঁড়ো করে রুটি বানাবো!

হঠাৎ বড়শিতে এক ঝাঁকুনি লাগল। আমি হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিপটা উপরে তুললাম। বাতাসে একটা মাছ লাফিয়ে উঠল। মাছটাকে টেনে নদীর কিনারে নিয়ে এলাম।

মাছটা ধরো! সুরিক চেঁচিয়ে বলে মাছটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাছটা তার হাত থেকে ফসকে লাফিয়ে লাফিয়ে নদীর দিকে যেতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুরিক মাছটাকে ধরে ফেলল। জ্যামের খালি বোতলটাতে পানি ভরে তার মধ্যে মাছটাকে রাখলাম আমি। মাছটা পরীক্ষা করে সে বলল, এটা তো পার্চ মাছ। আমি নিশ্চিত। দেখো না, এর গায়ের দাগগুলো? এটা কী আমাকে দেবে?

ঠিক আছে দেব। আমরা অনেক মাছ ধরব তো।

আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক মাছ ধরলাম। সব মিলিয়ে ছোটো ছোটো ছয়টা পার্চ মাছ, চারটা গাজগিয়ন আর একটা ছোট্ট রাফ মাছ ধরলাম। বাড়ি ফেরার সময় সুরিক বোতলটা বয়ে আনছিল। আমাকে একবারও ধরতে দিচ্ছিল না।

বাড়ির কাছে আসতেই গেটে গামবুটের বদলে একটা নীল রঙের ডাকবাক্স দেখতে পেলাম। গামবুটটা সরিয়ে নেওয়াতে সুরিকের মন খারাপ হয়েছে বলে মনে হলো না। বরং তাকে বেশ খুশি দেখাচ্ছিল। সে বলল, এই ডাকবাক্সটা দারুণ।' তারপর সে দাদিমাকে মাছগুলো দেখাতে নিয়ে গেল। দাদিমা মাছগুলো দেখে বেশ খুশি হলেন।

কিছুক্ষণ পর আমি সুরিককে বললাম, দেখলি তো তোর মাছ তাড়ানোর মন্ত্র কোনো কাজেই লাগল না। আসলে ওসব মন্ত্রতন্ত্র কোনো কাজ করে না। আমি অন্তত তাতে বিশ্বাস করি না।

আমিও বিশ্বাস করি না। তুমি মন্ত্রে বিশ্বাস করলে ভাবতাম, তুমি হয় খুব বোকা না হলে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ।

এ কথায় দাদিমা হো হো করে হেসে উঠলেন। কারণ তিনি তো বুড়ি হয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরও তিনি মাছ তাড়ানোর মন্ত্রে একদমই বিশ্বাস করেন না।

[রুশ থেকে ইংরেজি : ফাইন্না সোলাস্কো]

নবনীল আহমেদ, তৃতীয় শ্রেণি, রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আমার কিছু বলার আছে

প্রিয় নবারুণ, আমার খুব মন খারাপ। সবাই আমাকে দুষ্টু বলে। দুষ্টুমি করলে নাকি বুদ্ধি কমে যায়? কথাটা কি সত্যি?

— লায়লা বিনতে আমীর, ষষ্ঠ শ্রেণি

নবারুণ: মানুষ বা কোনো প্রাণী বা গাছকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে দুষ্টুমি, তা আসলেই ভালো নয়। কোনো ক্ষতি হবে, এমন ভাবনা থেকে দুষ্টুমি করতে নেই। তবে নির্দোষ মজা পাওয়ার জন্য দুষ্টুমি একটুআধটু তো করতেই হয়, তাই না? সেরকম দুষ্টুমি তুমি করতেই পারো। বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যদেরকে মজা দিতে, চমকে দিতে দুষ্টুমি করলে কেউ বলবে না তোমার বুদ্ধি নেই। নাও, তুমি এবং তোমার মতো আর যে বন্ধুরা মজার মজার দুষ্টুমি করতে চায়, তাদের জন্য উপহার নিচের এই গল্প। পড়ে জানাবে কিন্তু, মজা পেলে কিনা। শুভেচ্ছা তোমার জন্য।

দুষ্টুদেরও বুদ্ধি আছে

মোহাম্মদ অংকন

সপ্তম শ্রেণির সবচেয়ে দুষ্টু ছাত্র হলো শিশির। শুধুমাত্র তার দুষ্টুমির জন্য বছর বছর স্কুল পালটাতে হয়। শিশিরের বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি খুব ভদ্রলোক। কিন্তু তার ছেলে যে এত দুষ্টু, তা কারো মাথায় আসে না। শিশির যখন ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণিতে উঠল, তখন কোনোমতে পাস করেছিল। তাই ফলাফলের দিনই স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন, ‘আমরা আর শিশিরকে আমাদের বিদ্যালয়ে রাখতে চাচ্ছি না। ও খুবই দুষ্টু ছাত্র, একদমই পড়ালেখা করে না।’ শিশিরের খারাপ ফলাফলের কারণে এমন একটি নিষেধাজ্ঞার জন্য সেদিন শত শত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সামনে তার বাবা-মাকে অপমানিত হতে হয়েছিল।

শিশিরের বাবা-মা একে অপরকে বললেন, ‘যাই হোক, ছেলে যতই দুষ্টু আর ফাঁকিবাজ হোক তাকে তো পড়ালেখা করাতেই হবে। কেননা, পড়াশোনা বন্ধ করে দিলে শিশির আরো বেশি দুষ্টু হবে।’

এমনটি ভেবে শিশিরের বাবা তাকে নতুন স্কুল নূরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সে বিদ্যালয়ের সবচেয়ে রাগি এবং ক্ষীপ্ত স্যার ছিলেন জনাব আরিফুল ইসলাম। শিশিরকে যেদিন ভর্তি করানো হলো, সেদিনই ঐ রাগি স্যারের কাছে নিয়ে ওয়াদা করানো হলো। স্যারের ভয়ে সে গড়গড়িয়ে শপথ করল, ‘আমি আর কোনোদিন দুষ্টুমি করব না। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন করব। নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসব। শিক্ষক, বাবা-মা ও গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা করব। বন্ধুদের সাথে কখনো ঝগড়া করব না...।’ সেদিন ওয়াদা করার সময় স্পষ্টই বোঝা গেল, শিশির আজ হতে সত্যিই সত্যিই ভালো হয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে ইতোমধ্যে সপ্তম শ্রেণির দুইটি মাস পেরিয়ে যায়। শ্রেণির আরেক দুষ্টু ছাত্র তারিফের সাথে শিশিরের বেশ সখ্যতা গড়ে ওঠে। তারিফও এ বছরই অন্য একটি বিদ্যালয় থেকে বদলি হয়ে এসেছে। তার ফলাফলও তেমন ভালো না। তার এক শিক্ষিকার সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। তারিফের বাবা ও মা দুইজনই ডাক্তার। ব্যস্ততার জন্য ছেলের খুব একটা খোঁজখবর রাখতে পারেন না। তাই তার ছেলেটি এমন দুষ্টু হয়েছে। বাসায় একদমই পড়ালেখা করে না। তার বাবা-মা এখন কোনো কিছুতেই ওর দুষ্টুমি থামাতে পারছেন না। লেখাপড়াতেও ভালো করাতে পারছেন না। বরং তারিফের কারণে সমাজে তাদের মুখ দেখানো মুশকিল হয়ে গিয়েছে এরকম অবস্থা এখন।

একই শ্রেণির দুই দুষ্টু শিশির ও তারিফ ধীরে ধীরে খুব ভালো বন্ধু হয়ে যায়। শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা নিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ করে আর অন্যদিকে ওরা দুইজন দুষ্টু দুষ্টু বুদ্ধি তৈরি করে। কীভাবে কাকে স্যারের কাছে মার খাওয়ানো যায়, কীভাবে স্কুল ড্রেস নোংরা করে দেওয়া যায় ইত্যাদি নানা দুষ্টু দুষ্টু বুদ্ধি তৈরি করে। হঠাৎ একদিন তাদের মাথায় শুভ বুদ্ধির উদয় হলো। তাদের শ্রেণিতে বিজ্ঞান শিক্ষক রোবট বানানো সম্পর্কে পড়িয়েছিলেন। তাই তারা দুইজন রোবট বানানোর পরামর্শ করল। শিশির বলল, 'তারিফ, আমরা তো রোবট বানানো সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম। চল না আমরা রোবট বানানোর চেষ্টা করি।' তারিফ যেন ওর কথায় সহজেই একমত পোষণ করল। বলল, 'খারাপ বলিস নাই তো রে! এবারের বিজ্ঞান মেলায় সবাইকে চমক দেখিয়ে দিব।'

সত্যই দুইজনের পরামর্শ অনুযায়ী তারা রোবট বানানোর কাজ শুরু করল। বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ও বাজার থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করল। বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেটের সহায়তাও নিল। রোবট বানানোর জন্য তারা কয়েকদিন শ্রেণিতে উপস্থিতির মাত্রা কমিয়ে দিল। এতে সবার সন্দেহ হতে লাগল। অনেকে বলতে থাকল, 'দুষ্টু দুইজন বোধ হয় আর লেখাপড়া করবে না। স্কুলে আসা তো ছেড়েই দিয়েছে।' একদিন স্যার তাদেরকে শ্রেণিতে দাঁড় করালেন। 'কী ব্যাপার, তোমরা এমনিতেই অনেক দুষ্টু, তারপর শ্রেণিতে ঠিকমতো আসছ না! এবার কী পরীক্ষায় পাস করতে পারবে?' ওরা স্যারের কথায় চুপ থাকল। আর শ্রেণির সকলেই জোরে জোরে হাসল। এসব দেখে ওদের একটু লজ্জা হলো। মনে মনে ভাবল, 'এ লজ্জার প্রতিশোধ আমরা নিব।'

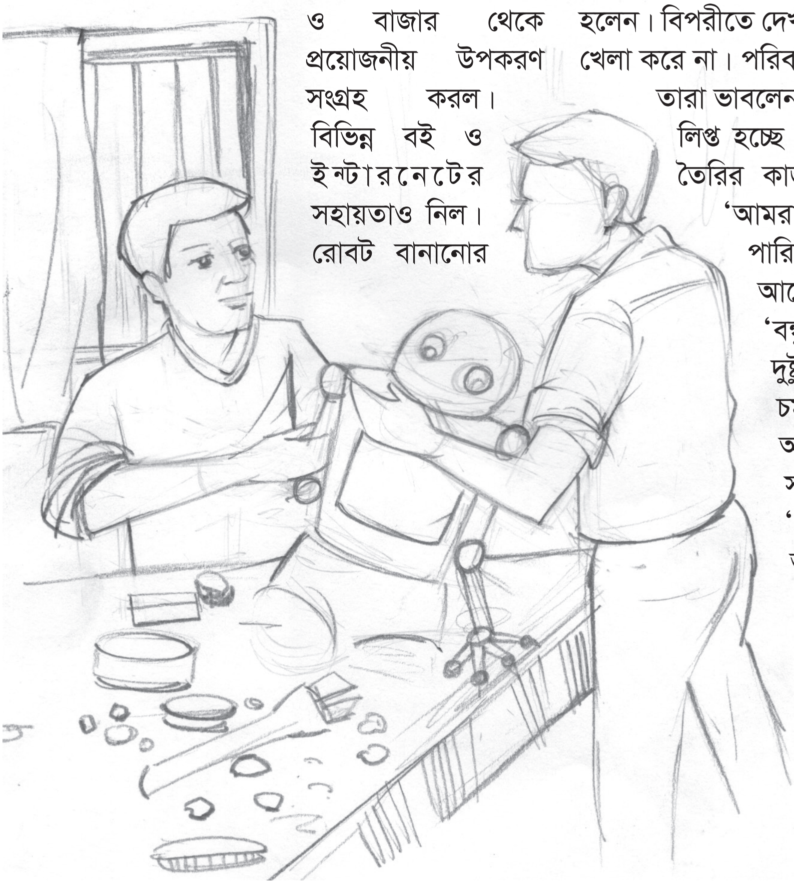

এভাবেই প্রায় বছরের ছয় মাস পেরিয়ে গেল। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলো। শ্রেণিতে খাতা দেখানোও শেষ হলো। সবাই বেশি বেশি নাম্বার পেল। কিন্তু শিশির ও তারিফ যেন ৩৩ এর ঘর অতিক্রম করতে পারল না। তাদের বাবা-মা লজ্জায় পরে তাদেরকে শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলেন। বিপরীতে দেখলেন, ওরা দুইজন বিকালে মাঠে খেলা করে না। পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হলো। তারা ভাবলেন, 'ওরা হয়ত কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হচ্ছে।' আসলে ওরা নিয়মিত রোবট তৈরির কাজ করছে। ওরা পণ করেছে, 'আমরা যদি সফলভাবে রোবট বানাতে পারি, তাহলে সবাইকে জানাব। তার আগে নয়।' তারিফ শিশিরকে বলল, 'বন্ধু, শ্রেণিতে সবাই আমাদেরকে দুষ্টু বলে। এবার আমরা সবাইকে চমকে দিব। দেখিয়ে দিব, আমাদেরও বুদ্ধি আছে।' ওর সাথে সুর মিলিয়ে শিশির বলল, 'এবার বিজ্ঞান মেলায় শ্রেণির ভালো ভালো শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভালো কিছু করে প্রথম পুরস্কার ছিনিয়ে নিবই আমরা।'

অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হলো। শ্রেণিতে গিয়ে মেলায় স্টল নেওয়ার জন্য আগ্রহী

> **‘আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে আমরা যেন মানুষ হই।’**
>
> জাতির পিতা
> **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**
> ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৭৫

শিক্ষার্থীদের আহ্বান করা হলো। শিশির দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমরা দুই বন্ধু একটি স্টল নিতে চাই।’

শ্রেণির সবাই একটু অবাক হলো। অনেকেই বলল, ‘ওরা তো লেখাপড়াই করে না, তবে স্টল দিয়ে খাবার, চা, বিস্কুট বিক্রি করবে নাকি? হা! হা!’ এমন মন্তব্যে শ্রেণির অনেকেই হাসল। শিশির ও তারিফের ভীষণ রাগ হলো। কিন্তু স্যার থাকার কারণে ওদেরকে আঘাত করল না। নতুবা তারিফ ও শিশির দেখিয়ে দিত দুষ্টুমি কাকে বলে! শ্রেণির সবার হাসাহাসি থামিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষক রফিক স্যার ওদের নাম খাতায় লিখে নিলেন। ওরা মেলায় একটি স্টল পেল। স্টলের নাম দেওয়া হলো- ‘রহস্য’।

দিনব্যাপী শুরু হয়ে গেল বিজ্ঞান মেলা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবাই সবার তৈরি জিনিসপত্র প্রদর্শনী শুরু করল। অনেকেই প্রযুক্তি নিয়ে অনেক কিছু বানিয়েছে। তাই আয়োজনটা বেশ জমজমাট হলো। তাদের এ মেলা দেখতে প্রতিবারের মতো এবারো প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা শিক্ষা অফিসার আসলেন। তিনি ঘুরে ঘুরে সকল স্টল দেখছিলেন এবং কারা কেমন নতুন নতুন জিনিস প্রদর্শন করেছে তা দেখছিলেন ও নোটবুকে লিখছিলেন। যখন শিশির ও তারিফদের স্টলে আসলেন, তাঁর চোখ যেন আটকে গেল। তিনি দেখতে পেলেন- ‘রহস্য’ স্টলে মানুষের মতোই একটি রোবট দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন সামনে আসলে সেই রোবটটি সালাম দিচ্ছে। কুশলাদী জিজ্ঞেস করছে। শিক্ষা অফিসার তাদেরকে বাহ্বা দিয়ে বললেন, ‘তোমরা এই মেলায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় কিছু তুলে ধরেছ যা তোমাদের বয়েসিরা এখনো করতে পারে নাই। তোমরা রোবট তৈরির জন্য প্রথম পুরস্কার পাবে। এগিয়ে চলো খোকারা।’

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সত্যই শিশির ও তারিফের নাম প্রথমে ঘোষণা করা হলো। তারা দু’জন যেন আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘বন্ধু, আমরা পেরেছি।’ তারা মঞ্চে উঠে পুরস্কার গ্রহণ করল। বিদ্যালয়ের সবাই যেন হতবাক হলো। ভালো ভালো শিক্ষার্থীরা যেখানে কিছু করতে পারল না, সেখানে দুই জন দুষ্টু ছেলে রোবট বানিয়ে অবাক করে দিল। তাদের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেন সমাপনী বক্তব্য দিলেন। ‘প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের মতো কিশোর-কিশোরীর মাথা জ্ঞান-বুদ্ধিতে ভরপুর। তার প্রমাণ আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী শিশির ও তারিফ। তারা যথেষ্ট দুষ্টু হওয়া সত্ত্বেও সবার থেকে আলাদা ও উন্নত চিন্তাধারার কিছু করেছে। তার মানে তোমরা চেষ্টা করলে সব পারবে। আর শিশির ও তারিফের প্রতি আমার উপদেশ, তোমরা যদি দুষ্টুমি ছেড়ে দিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো, তাহলে তোমরা প্রতিবারই ভালো ফলাফল করতে পারবে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এবার বার্ষিক পরীক্ষায় তোমাদের ফলাফল যেন ভালো হয় সে আশা করছি।’ সেদিন শিশির ও তারিফ স্যারের জ্ঞানগর্ভমূলক কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল।

সময়ের গতিতে বছর ফুরিয়ে আসলো। তারপর বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। ডিসেম্বরের ২৮ তারিখে ফলাফলও প্রকাশ করা হলো। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, শিশির প্রথম স্থান ও তারিফ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলো এবং প্রধান শিক্ষকের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করল। স্যার বললেন, ‘তোমরা দুষ্টু হলেও বুদ্ধিমান। আমরা চাই তোমরা প্রতিবারই এমন ফলাফল করো।’ শিশির ও তারিফের এমন সুন্দর ফলাফলে তাদের বাবা-মা খুব খুশি হলেন। সবাইকে গর্ব করে ছেলের কথা বলতে পারলেন। তারপর থেকে তারা সকল প্রকার দুষ্টুমি ছেড়ে দিয়ে ভালো করে লেখাপড়া শুরু করে দিল। বিদ্যালয়ের সকলেই তাদের বন্ধু হলো। অনেকেই পড়াশোনায় সহযোগিতা নিতে লাগল। কেউ আর তাদের দুষ্টু বলে ডাকল না।

BANGLADESH

গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের প্রথম স্বর্ণ

মেজবাউল হক

ছোট্ট বন্ধুরা, পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষণীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজেকে নতুন পরিচয়ে তুলে ধরা যায় সারা বিশ্বে, হওয়া যায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, পাওয়া যায় স্বর্ণপদক পুরস্কার। তেমনি একজন আহমেদ জাওয়াদ চৌধুরী। ও পড়ে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজে। এই শিক্ষার্থী রোমানিয়ার ক্লুজ-নাপোকাতে অনুষ্ঠিত ৫৯তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে (আইএমও) প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদক লাভ করে।

সে প্রতিযোগিতায় ৪২ নম্বরের মধ্যে সব মিলিয়ে ৩২ পেয়ে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড-২০১৮ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। যা বাংলাদেশের হয়ে প্রথম কারো আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের এই কৃতিত্ব অর্জন। এর আগে ২০১৭ সালে জাওয়াদ এই প্রতিযোগিতায় সিলভার পদক জিতে নেয়। জাওয়াদের স্বর্ণপদক ছাড়াও প্রতিযোগিতয় তিনটি ব্রোঞ্জ পদক ও দুটি অনারেবল মেনশন জিতেছে বাংলাদেশ।

গত কয়েক বছর আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে (আইএমও) বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা খুব ভালো ফল পেলেও স্বর্ণপদকটা অধরা থেকে যাচ্ছিল। এবার সেই পদক এসেছে জাওয়াদের হাত ধরে।

এক সাক্ষাৎকারে গণিতে পারদর্শী হয়ে উঠার গল্প বলতে গিয়ে জাওয়াদ বলেন, ডাচ-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসবে যখন প্রথম অংশ নিই, তখন আমি সবে মাত্র ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্স-এ উঠেছি। গণিতের সমস্যাগুলো সেই সময় থেকেই খুব ভালো লাগত। ৫০০ মজার সমস্যা কিংবা প্রাণের মাঝে গণিত বাজে–এই বইগুলো খুব আনন্দ নিয়ে পড়তাম। কিন্তু গণিত অলিম্পিয়াডে এসেই প্রথম বুঝতে পারলাম, আমি যতটা ভেবেছি, গণিতের জগৎ তার চেয়ে অনেক বড়ো। সেরাদের সেরা হওয়ার সুবাদে সেবার আমি প্রাথমিক গণিত ক্যাম্পে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাই। গণিতের জগতের মতো আমার জগৎটা বড়ো হতে থাকে। গণিতের মাধ্যমে অনেক বন্ধু বানানো যায়, মজা করা যায়, একটু একটু করে আমি বুঝতে পারি।

গত ৭ই জুলাই শুরু হওয়া এবারের অলিম্পিয়াডে ১১৬টি দেশের ৬১৫ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে ১১৪ নম্বর পেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ৪১ তম। সকল বিজয়ীদের নবারুণের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

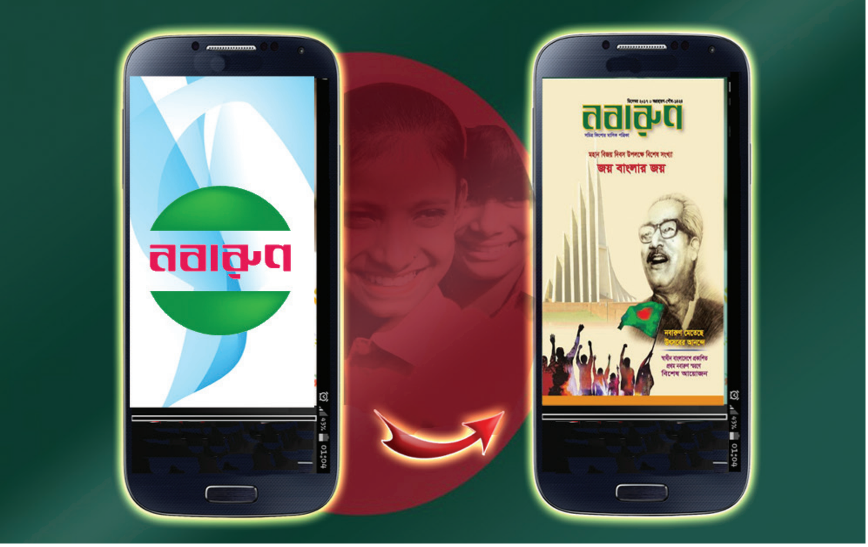

স্মার্ট ফোনে তোমার অ্যাপস

শাহ আকবর আহমেদ শুভ

প্রযুক্তির এই যুগে শিশু-কিশোরদের হাতেও চলে যাচ্ছে স্মার্ট ফোন। বাসার বড়োদের স্মার্ট ফোনগুলো ব্যবহার থেকে ওদেরকে থামানো যায় না। এদের কথা মাথায় রেখেই অ্যাপস স্টোরগুলোতে দিন দিন বেড়েই চলেছে শিশু-কিশোরদের উপযোগী অ্যাপস এর সংখ্যা। আবার এদের মধ্যে রয়েছে অনেক শিক্ষামূলক অ্যাপস যা শুধু বিনোদন দিবে না, এর সাথে শিখাবে অনেক কিছুই। আজ এমনই ৫টি অ্যাপস নিয়ে আলোচনা করব, যা ডাউনলোড ও ইন্সটল করতে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ অপশনে কেবল ইংরেজি নাম লিখলেই চলবে।

নবারুণ

নবারুণ হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো কিশোর মাসিক পত্রিকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি। এতে ছোটোদের উপযোগী বড়োদের লেখা নানান স্বাদের গল্প কবিতা ও নিবন্ধনের পাশাপাশি প্রকাশিত হচ্ছে অনধিক ১৮ বছর বয়েসি ছোটোদের লেখা ও আঁকা ছবি। পুরো পত্রিকাটি ৬৪ পৃষ্ঠার চার রঙে ঝকঝকে ছাপা যা শিশু-কিশোরদের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এখন নবারুণ শুধু পত্রিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, চলে এসেছে মোবাইল অ্যাপস-এও।

নবারুণ মোবাইল অ্যাপসটি ডাউনলোড ও ইন্সটল করতে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ অপশন এ লিখতে হবে ‘Nobarun’.

ম্যাথ কিডস

এই অ্যাপস শিশুদেরকে খেলার ছলে অংক ও ইংরেজি বর্ণমালা শিখায়। কয়েকটি ধাপে ছোটো ছোটো গেমস রয়েছে, যা শিশুদের খেলতে উৎসাহ বাড়াবে এবং সংখ্যা ও বর্ণমালার উপরে দক্ষতাও বাড়াবে। বাচ্চারা এখানে বিভিন্ন পাজেল গেমস এর মাধ্যমে যোগ বিয়োগও শিখতে পারবে। খেলার প্রত্যেকটি ধাপ পার করার সাথে সাথে সুন্দর সুন্দর স্টিকার জিততে পারবে। এটি কিন্ডারগার্টেন এর বাচ্চাদের জন্য বেশি উপযোগী ও কার্যকরী। এর জন্য সার্চ অপশন-এ লিখতে হবে ‘Math Kids’

কালার ফর কিড্‌স

এটি একটি মজাদার গেমস, যা শিশুদের বিভিন্ন খেলার ছলে বিভিন্ন রঙের নাম ও এর সাথে বর্ণমালা শিখতে সাহায্য করবে। এখানে প্রত্যেকটি রং দেখান হয়েছে বিভিন্ন ফল, শাকসবজি ও পশুপাখির সাহায্যে। মেঘ, পিয়ানো ইত্যাদি। এটি বিশেষ করে ছোটো বাচ্চাদের জন্য খুবই উপযোগী। অ্যাপসটির জন্য সার্চ অপশন এ লিখতে হবে ‘Color for kids’

ফ্রুট্‌স অ্যান্ড ভেজিটেবল ফর কিড্‌স

বাচ্চাদের বিভিন্ন ফল ও সবজির নাম শেখার জন্য এটি হতে পারে একটি আদর্শ অ্যাপস। বিভিন্ন চার্ট এর মাধ্যমে ফল ও সবজির নাম দেওয়া হয়েছে যা বাচ্চাদের শিখতে সাহায্য করবে। সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যও আছে এখানে। অ্যাপসটি প্রায় দশ মিলিয়নেরও বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে। অ্যাপসটি ডাউনলোড ও ইন্সটল করতে চাইলে সার্চ অপশন এ লিখতে হবে ‘Fruits and Vegetables for Kids’

প্রি-স্কুল লারনিং

এই অ্যাপসটি ২ থেকে ৫ বছরের বাচ্চাদের শিক্ষামূলক অ্যাপসগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা। বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার আগে ইংরেজি বর্ণমালা, গণনা, বিভিন্ন বস্তুর আকার আকৃতি সম্পর্কে সুন্দর করে ধারনা দেওয়া আছে। এই অ্যাপসটি ১০ মিলিয়নেরও বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে। অ্যাপসটি চাইলে সার্চ অপশনে লেখ-'Preschool Learning Games Kids'

এবার বলব এমন ৫টি শিক্ষামূলক অ্যাপস যা যে-কোনো বয়েসি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই কার্যকরী। তোমরা যদি স্কুল কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটিতে পড় তাহলে এই অ্যাপসগুলো তোমাদের জন্যই। যা তোমাদের দৈনন্দিন পড়াশুনাকে করে তুলবে আরো স্মার্ট। কথায় আছে 'Don't study hard, Study smart!'

ইউডিকশনারি

এটি এমন একটি অ্যাপস যা তোমাদের ইংরেজি ভোকাবলারি স্কিল বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে একদম নেক্সট লেভেল-এ। এই অ্যাপসটি যদি তোমরা ডাউনলোড করে ইন্সটল করো তাহলে তোমরা যখনি তোমাদের মোবাইল স্ক্রিন এর লক খুলতে যাবে তখনি তোমাদের একটি করে ইংরেজি ওয়ার্ড দেখাবে আর তোমরা যদি এই ওয়ার্ড এর সঠিক উচ্চারণ জানতে চাও তাহলে ওয়ার্ড এর নিচে অডিও বাটনে ক্লিক করলেই এর সঠিক উচ্চারণ তোমাকে জানিয়ে দিবে। আবার তুমি যদি এর বাংলা অর্থ জানতে চাও তাহলে ইংরেজি ওয়ার্ড এর উপর ক্লিক করলেই তোমার মোবাইল স্ক্রিনে এর বাংলা অর্থ দেখাবে।

তোমার কি ভুলে যাওয়ার অভ্যাস আছে? যে-কোনো কাজ সময়মতো করতে পার না? তাহলে এই অ্যাপসটি তোমার জন্যই।

একবার ভাবো তো প্রতিদিন তুমি তোমার মোবাইল এর লক কত বার খুলো? আর প্রতিবার যদি তুমি একটি করে ইংরেজি ওয়ার্ড এর মানে শিখে ফেল তাহলে ১ মাসে তুমি কতগুলো ইংরেজি ওয়ার্ড এর মানে শিখে ফেলতে পারবে? আজকেই সার্চ দাও- 'U-Dictionary: Best English Learning Dictionary'

টাইমটেবিল

তোমার কি ভুলে যাওয়ার অভ্যাস আছে? যে-কোনো কাজ সময়মতো করতে পারো না? তাহলে এই অ্যাপসটি তোমার জন্যই। এর সাহায্যে তুমি তোমার সব কাজ যেমন- ক্লাস, পরীক্ষা, টিউশনি, খেলা, খাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদির সময়সূচি সেট করে অ্যালার্মও সেট করে নিতে পার। তাহলে তোমার লাইফস্টাইল এর সকল কাজ এই অ্যাপসটি ঠিক সময় মতো তোমাকে অ্যালার্ম এর মাধ্যমে জানিয়ে দিবে। এক্ষুনি সার্চ দিতে পার 'Timetable'।

কুইজলেট

তুমি চাইলে তোমার পড়াশুনার অগ্রগতির একটা পরিকল্পনাও সাজিয়ে নিতে পার এখানে। নির্দিষ্ট সময় পর পর জানিয়ে দিবে তোমার পড়াশুনা ঠিকভাবে আগাচ্ছে না পিছিয়ে আছ তুমি। ভাষা শেখার জন্য এটা অসাধারণ। অডিও ও ভিডিও-এর মাধ্যমেও শিখে নিতে পারো অনেক বিষয়। যদি একে চাও, তবে লিখে ফেল-'Quizlet'

পকেট

ইন্টারনেট ঘাটতে ঘাটতে কোনো আর্টিকেল পছন্দ হলো কিংবা কোনো ভিডিও পছন্দ হলো কিন্তু সময়ের অভাবে সেই আর্টিকেলটি বা ভিডিওটি দেখা হলো না। আবার পরে যখন সময় হলো তখন সেই আর্টিকেল বা ভিডিওটি খুঁজে পাই না। তখন খুব বিরক্ত লাগে তাই না? তাহলে এই অ্যাপসটি হতে পারে তোমার জন্য, কারণ যখনি তোমার কিছু পছন্দ হবে ঠিক তখনি এই অ্যাপসটিতে সেভ করে রাখতে পারবে আর পরে তুমি তোমার সময়মতো সেই আর্টিকেল বা ভিডিওটি দেখে নিতে পারবে। এছাড়াও তুমি তোমার সকল গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট সংরক্ষণ করে রাখতে পার এই অ্যাপস-এ। কাজেই, সার্চ দাও-'Pocket'

এক্সাম কাউন্টডাউন

এই অ্যাপসটির মাধ্যমে তুমি তোমার যাবতীয় পরীক্ষার সময়সূচি লিপিবদ্ধ করে নিতে পার। অ্যাপসটি পরবর্তীতে তোমাকে ক্রমাগত মনে করিয়ে দিবে এবং সাবধান করে দিবে পরীক্ষার ব্যাপারে। পরের পরীক্ষা ঠিক কত দিন কিংবা কত ঘণ্টা পর, এর হিসাব রাখা এবং সতর্ক করে দেওয়াই এর কাজ! এক্ষুনি সার্চ দাও- 'Exam Countdown'

নদী
ধারাবাহিক

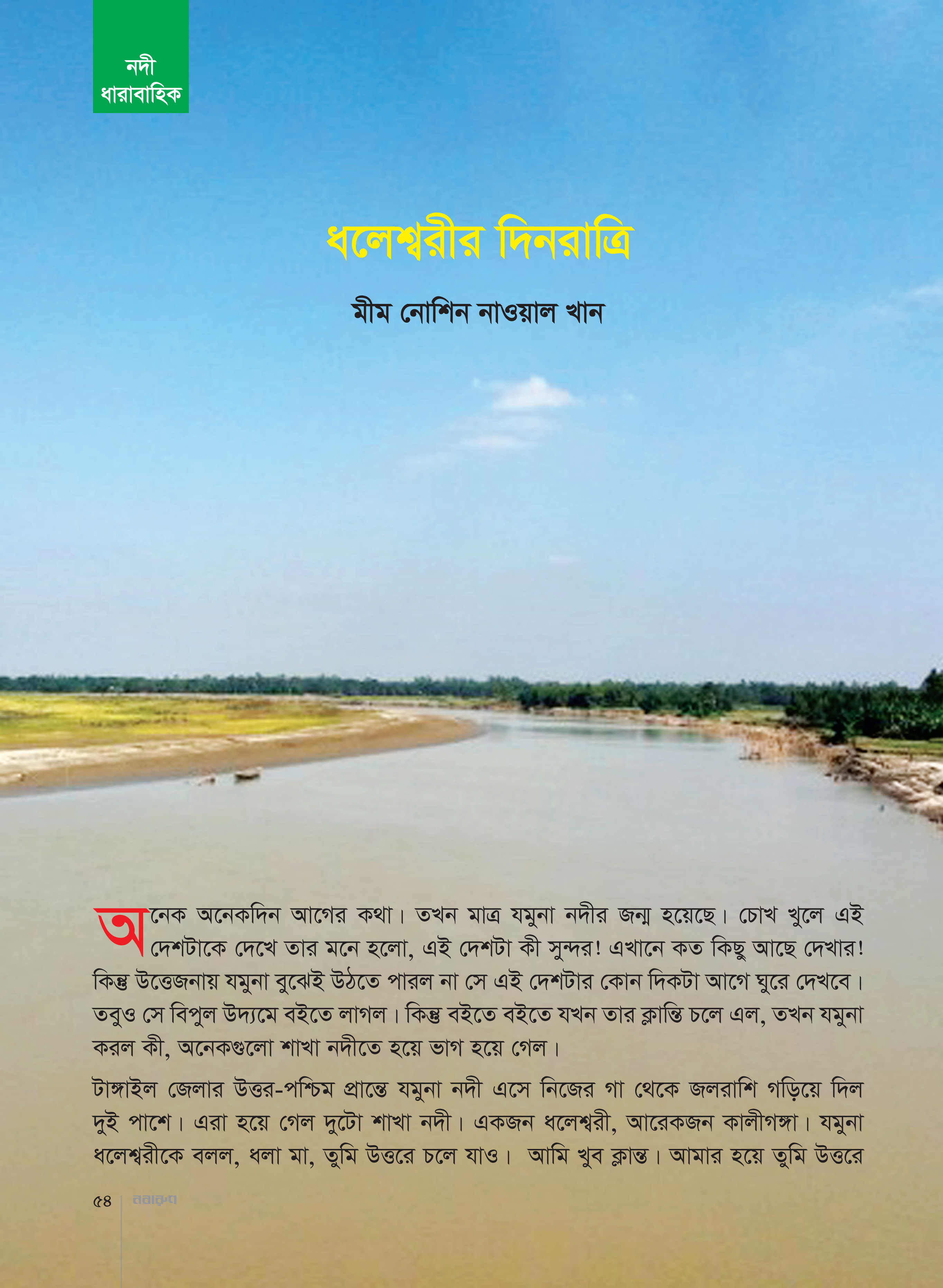

ধলেশ্বরীর দিনরাত্রি

মীম নোশিন নাওয়াল খান

অনেক অনেকদিন আগের কথা। তখন মাত্র যমুনা নদীর জন্ম হয়েছে। চোখ খুলে এই দেশটাকে দেখে তার মনে হলো, এই দেশটা কী সুন্দর! এখানে কত কিছু আছে দেখার! কিন্তু উত্তেজনায় যমুনা বুঝেই উঠতে পারল না সে এই দেশটার কোন দিকটা আগে ঘুরে দেখবে। তবুও সে বিপুল উদ্যমে বইতে লাগল। কিন্তু বইতে বইতে যখন তার ক্লান্তি চলে এল, তখন যমুনা করল কী, অনেকগুলো শাখা নদীতে হয়ে ভাগ হয়ে গেল।

টাঙ্গাইল জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যমুনা নদী এসে নিজের গা থেকে জলরাশি গড়িয়ে দিল দুই পাশে। এরা হয়ে গেল দুটো শাখা নদী। একজন ধলেশ্বরী, আরেকজন কালীগঙ্গা। যমুনা ধলেশ্বরীকে বলল, ধলা মা, তুমি উত্তরে চলে যাও। আমি খুব ক্লান্ত। আমার হয়ে তুমি উত্তরে

গিয়ে দেখে এসো, কী আছে ওখানে। আমি এখানেই আছি। আমাকে সব গল্প শোনাবে কিন্তু! ধলেশ্বরী মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা মা। আমি তবে আসি।

এই বলে সে উত্তর দিকে চলে গেল। তারপর যমুনা কালীগঙ্গাকে পাঠিয়ে দিল দক্ষিণে। কালীগঙ্গা ছুটে গেল দক্ষিণ দিক ধরে।

ধলেশ্বরী প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। সে টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জ জেলা ঘুরে ঘুরে দেখল। কুলকুল করে বয়ে বেড়ালো। কিন্তু কালীগঙ্গা বড্ড অলস মেয়ে। মানিকগঞ্জের কাছে এসে তার সঙ্গে যখন ধলেশ্বরীর দেখা হলো। সে বলল, ধলা দিদি, আমি আর এত ঘুরতে পারছি না গো। আমাকে তোমার কোলে আশ্রয় দাও না!

ধলেশ্বরী দু'হাত বাড়িয়ে বোনকে বুকে টেনে নিল। ধলেশ্বরীর গায়ে মিশে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ধলেশ্বরীর পরিচয়েই বইতে লাগল কালীগঙ্গা।

কালীগঙ্গাকেও নিজের বুকে নিয়ে চলতে চলতে একসময় ধলেশ্বরীও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন সে নারায়ণগঞ্জের কাছে এসে যখন শীতলক্ষ্যা নদীর দেখা পেল, একটুও দেরি করল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কোলে। শীতলক্ষ্যা মায়ের স্নেহে ধলেশ্বরীকে নিয়ে বয়ে চলল। চলতে চলতে সে পরবর্তীতে মেঘনা নদীতে গিয়ে মিশে গেল। আর এই লম্বা পথ ঘুরে ধলেশ্বরীর দৈর্ঘ্য হলো ২৯২ কিলোমিটার এবং গড় প্রস্থ ১৪৪ মিটার।

তবে কেউ কেউ বলেন, ধলেশ্বরী আসলে পদ্মা নদীর মেয়ে ছিল। ধলেশ্বরী এবং বুড়িগঙ্গার মধ্য দিয়ে পদ্মা গিয়ে মিশেছিল মেঘনায়। কিন্তু পরে ধলেশ্বরীর সঙ্গে ঝগড়া করে পদ্মা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। দক্ষিণ দিকে সে কীর্তিনাশা নদীর কাছে চলে গিয়েছিল। আর এখনো সে সেখান দিয়েই বয়ে চলছে।

যমুনা যখন এসে ধলেশ্বরীকে কাঁদতে দেখে, তখন নাকি তার খুব মায়া হয়। সে তখন ধলেশ্বরীকে নিজের মেয়ের মতো করে কাছে টেনে নেয়। তারপর তাকে আবার নতুন উদ্যমে বইতে শেখায়। অবশ্য ধলেশ্বরী কিন্তু এখন যমুনাকেই মা বলে ডাকে। যদি কখনো ধলেশ্বরী নদীতে যাও, কান পাতলেই শুনতে পাবে, সে তার মাকে তার দুই পাড়ের গল্প শোনাচ্ছে অবিরাম।

সদা সত্য বলিবে

সুলতানা বেগম

পঞ্চান্ন বছর বয়সি এক লোক। দেখতে সুঠাম দেহের অধিকারী। পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সে প্রতিদিন কমলাপুর রেলস্টেশনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে যাত্রীদের কাছে যেত এবং তার পাইলসের সমস্যা বলে সাহায্য চাইত। অনেকে সাহায্য করত আবার অনেকে এড়িয়ে যেত। একদিন আমি ট্রেনে বসে একটু দূরে তাকাতেই দেখি লোকটি ভালোভাবে হাঁটছে আবার কোনো লোক দেখলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। অবাক হলাম। মনে মনে ভাবলাম কত ধরনের মানুষ আছে দুনিয়ায়। তারপর অনেকদিন স্টেশনে দেখিনি লোকটিকে। প্রায় এক বছর পর হঠাৎ স্টেশনে চোখে পড়ল লোকটিকে। দেখি, এক পা কাটা। স্ক্রেচারে ভর করে হাঁটছে। প্রথমে চিনতে একটু দেরি হয়েছিল। মনে করতে পারছিলাম না। তারপর মনে পড়ল এই সেই লোক যে মিথ্যা বলে সাহায্য চাইত। আমি লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম- আপনার পায়ের এ অবস্থা কেন? আগে না ভালো ছিলেন। জবাবে সে বলল, ভাগ্যের লিখন, ট্রেনে কাটা পড়ে এই অবস্থা হয়েছে।

বন্ধুরা, লোকটি যখন ভালো ছিল তখন সে মিথ্যা বলে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে সাহায্য নিত। মহান আল্লাহ তায়ালা তার মিথ্যা অভিনয়কে বাস্তবে লিখে দিয়েছেন তার ললাটে। তাকে খোঁড়া বানিয়ে দিয়েছে। মিথ্যার পরিণাম কী হলো দেখলে তো বন্ধুরা। তাই, তোমরা সদা সত্য কথা বলবে। মনে রেখো বন্ধুরা- 'সত্যের পথে অবিরত চলে যারা, জীবনে কোনোদিন হারবে না তারা'। কখনো মিথ্যা বলবে না, কাউকে মিথ্যা বলার সুযোগ দিবে না। মিথ্যা বলা নিজের জন্য যেমন ক্ষতিকর অন্যের জন্যও। এর পরিণাম কখনো ভালো হয় না। আর মহাপাপ তো আছেই।

নতুন পড়ুয়াদের
জন্য সহজ গপ্প

তুলতুলে মুরগির বাচ্চা

হাসান রাউফুন

সামিহা ভিকারুননিসা নূন স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন সে স্কুলে ঢুকতেই দেখে ধবধবে সাদা অনেকগুলো মুরগির বাচ্চা। বাচ্চাগুলো নিয়ে একটি লোক বসে আছে। কাগজের বাক্সের মধ্যে বাচ্চাগুলো চিঁ চিঁ করছে।

কী সুন্দর দেখতে! তুলতুলে গা। লাল টকটকে ঠোঁট ও পা। ক্লাস শুরু হয়ে যাবে বলে ওর মা তাড়া দিলেও সে একটি বাচ্চা হাতে তুলে নাড়তে থাকে। সামিহার মা বাধ্য হয়ে ২টি বাচ্চা কিনে বলল, তুমি ক্লাসে যাও। বাসায় এসে এদের আদর করো। বাচ্চা দুটি পেয়ে সামিহা খুব খুশি। ২টি বাচ্চাকে ২টি চুমো দিয়ে নাচতে নাচতে মেইন গেট দিয়ে স্কুলে ঢুকে যায়। যাবার সময় হাত নেড়ে নেড়ে বলল, মামণি সাবধানে রেখো।

বাসায় এসে বাচ্চা দুটিকে সে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে। নিজ হাতে খাবার খাওয়ায়। পানি খাওয়ায়। ওর বাবাকে বলল, মোটা কাগজ দিয়ে একটি ঘর বানিয়ে দাও। ওদের ঘরে ওরা নিরাপদে থাকবে। ওর বাবা বলল, আগামীকাল বানিয়ে দেব।

অনেক রাত হয়েছে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ বাচ্চা দুটি চেঁচিয়ে ওঠে। তিনজনের ঘুম ভেঙে যায়। দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে একটি বাচ্চার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। আরেকটি এক কোণে বসে কাঁপছে।

বাচ্চা দুটির জন্য সামিহা সারা ক্লাসে মন বসাতে পারে না। ওর মনে প্রশ্ন ঘুরতে থাকে। মামণি কোথায় বাচ্চা দুটি রাখবে? কী খাওয়াবে? খাবার খাইয়েছে কিনা? ইত্যাদি ভাবতে থাকে। স্কুল ছুটি হয়ে যায়। ওর বেস্ট ফ্রেন্ড তো দূরের কথা কারো সাথেই আজ কথা বলার সময় পায় না। ক্লাস থেকে লাফাতে লাফাতে বেরুনোর সময় শুধু বলল, ২টি মুরগির বাচ্চা কিনেছি, দেখতে এসো।

সামিহার মা আহত বাচ্চাকে পাকঘরে নিয়ে যায়। সামিহার বাবা ও সামিহা দুজনও তার সাথে সাথে যায়। চিকা (বড়ো ইঁদুর) পায়ে কামড় দিয়ে বাচ্চাটির পা অনেকখানি কেটে দিয়েছে। সামিহার মা বাচ্চার ক্ষত পায়ে একটু

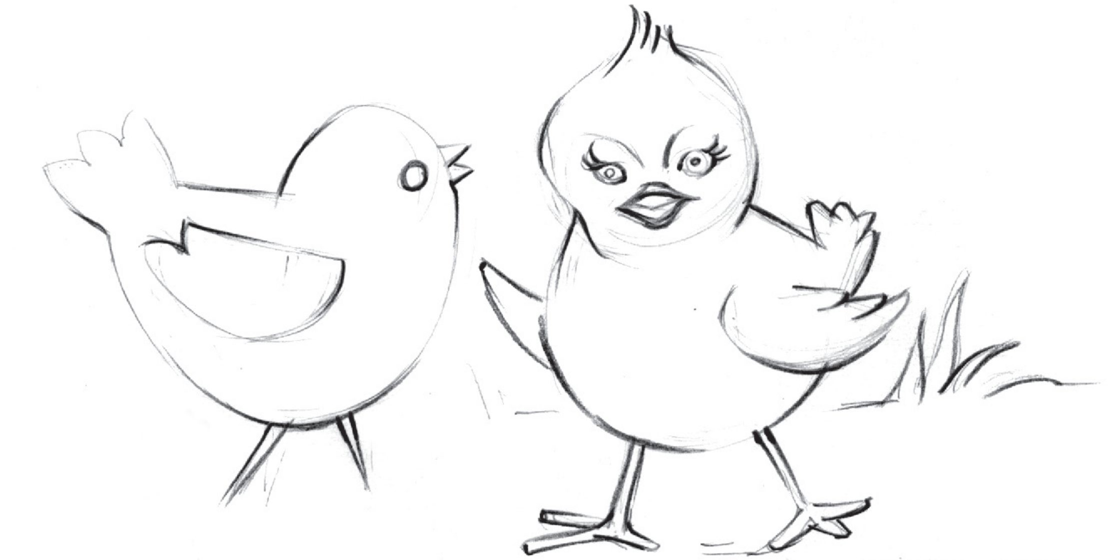

মুরগির বাচ্চাদেরকে মনের মতো রং করে দাও না!

মরিচ ও হলুদ গুঁড়া লাগিয়ে এক টুকরা কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়। বাচ্চাটি চিঁ চিঁ করে ওঠে।

দু-দিন সামিহা স্কুলে যায়নি। বাচ্চাকে কোলে কোলে রেখেছে। যত্ন করেছে। ঠিকমতো খাবার দিয়েছে। আর বার বার বাবাকে বলেছে, তুমি ঘর বানিয়ে দিলে এমন হতো না। সামিহার বাবাও নরম সুরে বলল, সময়ের কাজ সময়ে করলে এমন হতো না। মামণি আমি দুঃখিত। এমনটি আর হবে না।

বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে ওঠে। এখন আগের মতো দৌড়াতে পারে। আয় আয় করে ডাকলে ছুটে আসে। বাচ্চা দুটি এখন সামিহার খেলার সাথি। পড়ালেখা শেষে সামিহা ওদের সাথে খেলে। বাচ্চা দুটিও সামিহার বন্ধু হয়ে গেছে। সবসময় ওর পড়ার টেবিলের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে।

বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দলগুলোর পতাকা নিজের হাতে এঁকে কবিতা পাঠিয়েছে ছোট্ট বন্ধু **লাবিবা তাবাস্সুম রাইসা**

তোমার আমার বিশ্বকাপ

আপুর নাম মিনা,
আপু আর্জেন্টিনা।
আকাশে ওড়ে চিল,
আমি ব্রাজিল।
বরফে আচ্ছাদিত স্থান মেরু,
বড়ো মামা পেরু।
আমার বন্ধু টিয়া,
সে নাইজেরিয়া।
ধরো তোমার কান,
চাচা ইরান।
আছি আমি শুয়ে ,
বাবা উরুগুয়ে।
করো চা পান,
খালা জাপান।
আমি খাই আম,
সে বেলজিয়াম।
পকেটে নাই মানি,
ভাইয়া জার্মানি।
আরেক বন্ধু তাসফিয়া,
সে কলম্বিয়া।
খাচ্ছি আমি দুধের সর,
মামা মিশর।
বোনের নাম আলিয়া,
সে অস্ট্রেলিয়া।
আমার আছে পেন,
সে সুইডেন।
মিতুর বোন রিয়া,
সে দক্ষিণ কোরিয়া।
তুমি পর্তুগাল,
মামা সেনেগাল।
ঈদ ছিল কাল।
আমার প্রিয় মা,
সে কী জানি না।

চতুর্থ শ্রেণি
বি,এ,এফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ
ঢাকা।

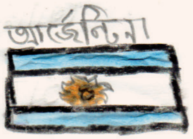

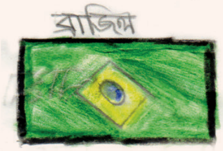

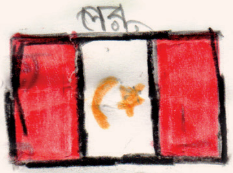

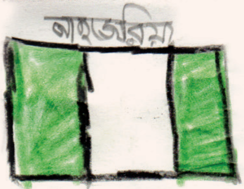

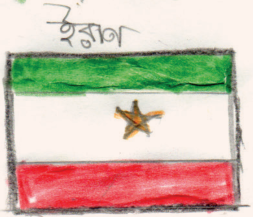

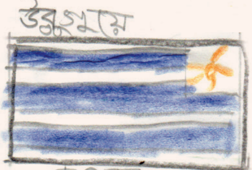

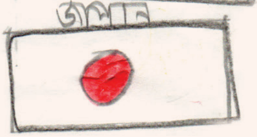

পৃথিবীর প্রাচীন মেলা

রফিকুল ইসলাম রফিক

মানুষ নিজের প্রয়োজনে ও চাহিদা পূরণের জন্য অনেক কিছুই তৈরি করেছে। যখন মানুষ বুঝতে পারল পণ্য কেনাবেচার জন্য একটি জায়গা প্রয়োজন, সম্ভবত সে চিন্তা থেকেই বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস ব্যক্তিদের অনেকের ধারণা মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শেখার পরই মেলার সূচনা হয়েছিল। মেলা সার্বজনীনভাবে সারা বিশ্বে অনুষ্ঠিত হয়। মেলার পূর্ব ইতিহাস জানতে হলে আমাদের অতীতে ফিরে তাকাতে হয়। তাহলে এ যুগের মেলার সাথে সে যুগের মেলার পার্থক্য এবং যুগে যুগে তার অগ্রগতি ও বিবর্তন কেমন ছিল, তা ধরা যাবে। এই উপমহাদেশে ভারতের উত্তর অঞ্চলে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে হরিদ্বার, সেখানে রয়েছে হিন্দুদের একটি বিরাট তীর্থস্থান। মেলা বিশেষজ্ঞরা জানান, অনেক কাল থেকেই নাকি সেখানে বসে মেলা। হয়ত দু'হাজার বছর আগে থেকে। সম্ভবত সে মেলা আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন এবং দীর্ঘজীবী মেলা।

এর পরবর্তী সময়ে ফ্রান্সের এক লেখকের লেখা থেকে মেলার তথ্য জানা যায়। নাম তার সিজেনিয়ুস অ্যাপেলিনারিস। তিনি লিখেছিলেন পঞ্চম শতকে। তার মতে, সেখানে মাতান আর ব্রিতে অনেক বড়ো মেলা আয়োজিত হতো। একদিকে ধর্মাশ্রয়ী, অপরদিকে বাণিজ্যিক এ মেলাগুলো নিয়মিত বসত কিনা এ সম্পর্কে তথ্য জানা যায়নি। অবশ্য তখন ইউরোপে বাণিজ্যিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেসবের মধ্যে অন্যতম শমেমোনর (খ্রি.৭৪২-৮১৪) প্রবর্তিত মেলা। তবে সারা পশ্চিম ইউরোপে দশম শতকের মধ্যেই একাধিক মেলার আয়োজন করা হতো। ফ্রান্সও এক্ষেত্রে এগিয়ে আছে।

প্রাচীনকালে কাবাকেন্দ্রিক আরেকটি মেলা আয়োজিত হতো। বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ইসলাম প্রবর্তনের পূর্বে এই মেলার প্রচলন। এই মেলা আরবের মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিল। আরব দেশের নানা গোত্রের দখলে তখন কাবা। পালাক্রমে এক এক গোত্রের নেতার ওপর তার দেখাশুনার দায়িত্ব পড়ে। একবার হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর দাদা আব্দুল

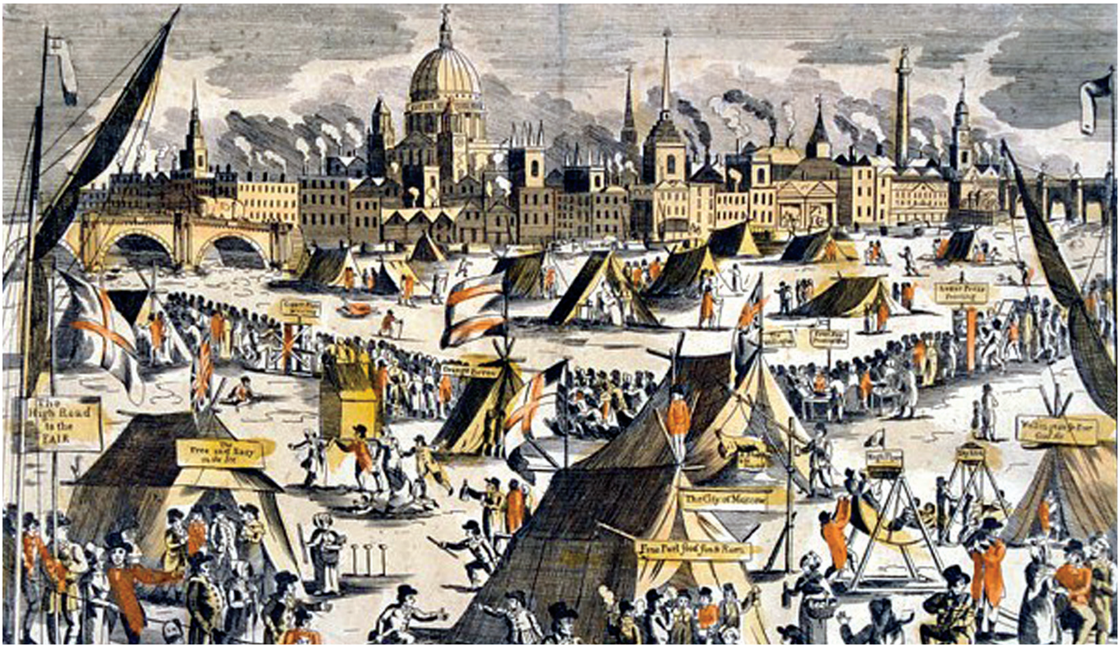
The High Road to the FAIR
Free and Easy on the Ice
The City of Moscow

চিত্রে পুরোনো দিনের ঐতিহ্যবাহী মেলা

কৃশণ মাহমুদ নিয়োগী, অষ্টম শ্রেণি, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মোত্তালিব এ দায়িত্ব পেলেন। তার সময়েই এক দারুণ ঘটনা ঘটে যায়।

সে সময় এক বাতিক মেলা কাবায় বসেছে। সেটা দেখে বাইরের লোকের চোখ টাটায়। আরবের দক্ষিণে ইয়েমেন সে সময় এক খ্রিষ্টান দেশ ছিল আবিসিনিয়ার শাসকের অধীন। সম্রাটের হয়ে ইয়েমেন শাসন করে আবরাহা নামের ছোটো এক খ্রিষ্টান রাজা। দীর্ঘদিন থেকে তিনি কাবার মেলার জাকজমক দেখে জ্বলছিলেন মনে মনে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। এ রকম একটি মেলা বসাবেন তার রাজ্যের রাজধানী সানা শহরে। তার জন্য ব্যাপক আয়োজন করা হলো। কিন্তু সব ব্যর্থ হলো। সানার মেলার একটি লোকও আসেনি। তখন আবরাহা যথেষ্ট রেগে সিদ্ধান্ত নিলেন কাবাই রাখবেন না। ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দিবেন। এর জন্য তিনি সৈন্যসামন্ত হাতি-ঘোড়ার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে কাবার বিরুদ্ধে অভিযানে গেলেন। কিন্তু সবকিছু বৃথা হয়ে গেল। জনশ্রুতি বলে,আল্লাহর ইচ্ছায় আবরাহার সবকিছু ধ্বংসে পরিণত হয়।

ইংল্যান্ডে এক হাজার কিংবা বারোশত অথবা তারও আগে মেলার আয়োজন করা হতো। বৈচিত্র্যের দিক থেকে তখন অন্যতম ছিল স্টার ব্রিজের মেলা। স্টার ব্রিজের মেলা থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য পাঠানো হতো। ঘৌড়া দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, পুতুল নাচ এগুলো ছিল স্টার ব্রিজের মেলার বড়ো আকর্ষণ। দিনের পর দিন মেলার বিবর্তন ঘটেছে। আজকাল শিল্প সামগ্রী নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেলা। ১৮৫১ সালে লন্ডনের হাইড পার্কের ক্রিস্টাল প্যালেসে ইউরোপের প্রথম আধুনিক শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালের ব্রিটেন উৎসব এর প্রমাণ। এটি মেলা হলেও ব্রিটেনের জাতীয় জীবনের উৎসব আকারে অনুষ্ঠিত হয়। টেমস নদীর দক্ষিণ পাড় ছিল এর মূল স্থান। লন্ডন এবং মফস্বলের ছোটো ছোটো প্রদর্শনী এ মেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এ মেলার পরও অনেক বিশাল আকৃতির মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে ব্রাসেলসের আন্তর্জাতিক মেলা সবচেয়ে বড়ো।

১৮৭৬ সালে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় আমেরিকার উৎসব জাতীয় মেলা। আমেরিকার স্বাধীনতার প্রথম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফিলাডিলফিয়া ছিল মেলার স্থান। ১৮৯৩ সালে শিকাগো মেলার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের স্মারক হিসেবে আয়োজিত হয় এ মেলা। মেলার পরিমাণ ইদানীং আরো বেড়ে গিয়েছে। প্রতি বছর শুধু আমেরিকাতেই দু'হাজারের বেশি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আজকের পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় প্যারিসের আইফেল টাওয়ার। আমরা হয়ত জানি না, টাওয়ারটি আলাদাভাবে শুধু একটি মিনার হিসেবে নির্মাণ করা হয়নি। এটি নির্মাণ করা হয় ১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলার প্রধান আকর্ষণ রূপে। মেলার পর ঘরবাড়ি সব ভেঙে ফেলা হলেও টাওয়ারটি সংরক্ষণ করা হয়। এটি শুধু মেলার স্মারকই নয় পৃথিবীর অন্যতম দর্শনীয় স্থান আর প্যারিসের গৌরব।

উপমহাদেশে মোগল আমলে আয়োজিত হতো মিনা বাজার। ছোটো আকারে হতো এ মেলা। মীনা বাজারকে তাই মিনি মেলাও বলা চলে। মোগল হেরেমের মীনা বাজার খুবই সুসজ্জিত করা হতো। এর আয়োজন করত হেরেমের নারীরা। তবে সেটা অবসর বিনোদন ও কিছু মুনাফা করার উদ্দেশ্যে ছিল। মীনা বাজারে পণ্য থাকত হরেকরকম তবে তা পরিমাণে অল্প। এক থেকে দু-দিন স্থায়ী হতো এ মীনা বাজার।

স্বপ্নে মেঘের মাঝে

সংহতি সরকার

বাসের চওড়া সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুধুই চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কল্পনার কোনো কুল-কিনারা করতে পারছিলাম না। ভাবতে ভাবতে চোখ লেগে গেল। বাবার ডাকে ঘুম থেকে উঠার নিত্য অভ্যাস বলা যায়। কিন্তু আজ ঘুমটা ভাঙল মানুষের চিৎকার আর বাসের ঝাঁকুনিতে। আচমকা ঘুম ভাঙার পর দেখি বাসটা ডানদিকে প্রায় ৬০ ডিগ্রি কোণে বেঁকে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম এই বুঝি পড়ে গেলাম।

বাম পাশে পাহাড়। ডান পাশে নীচে তাকালে খাদ। পাহাড় কেটে বানানো রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে চলছে বাস। বাসের জানালা দিয়ে বাম পাশের পাহাড়ের গায়ে জন্মানো গাছগুলো ভেতরে চলে আসে। আর জানালায় বাড়ি খায়। একটা সময় ডান পাশে খাদের গভীরতা কমে আসে।

দেখলাম দূরে কয়েকটা বাড়ি। খড়, বাঁশের বেড়া আর কাঠ দিয়ে বানানো। কতটা উপরে উঠেছি তা ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে মেঘ যাচ্ছে। দেখে বুঝলাম প্রায় অনেকখানি উপরে উঠেছি। চারপাশে যেন মেঘেরা নেচে বেড়াচ্ছে।

সেই ছোটোবেলা থেকে আকাশটা আমার কাছে বড়োই অদ্ভুত। মেঘের উড়ে চলা দেখতে ভীষণ ভালো লাগে আমার।

নীল আকাশে মেঘের হাঁটাচলা তার মধ্যে এক অকল্পনীয় সৌন্দর্য। এখন যেন সৌন্দর্যের বিচরণ হচ্ছে আমার চারপাশে। মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরতে পারব। এখানকার মানুষদের কত আনন্দ, তাই না! চারপাশে মেঘেরা হেঁটে বেড়ায়। তা দেখতেই আমার আনন্দ।

তারপর বাসটা থামল খাগড়াছড়িতে। সেখান থেকে চাঁদের গাড়িতে করে গেলাম সাজেক ভ্যালিতে। এটা আরো উঁচুতে। এখানে আমি যেন মেঘকে ছুঁতে পারব বলে মনে হচ্ছে।

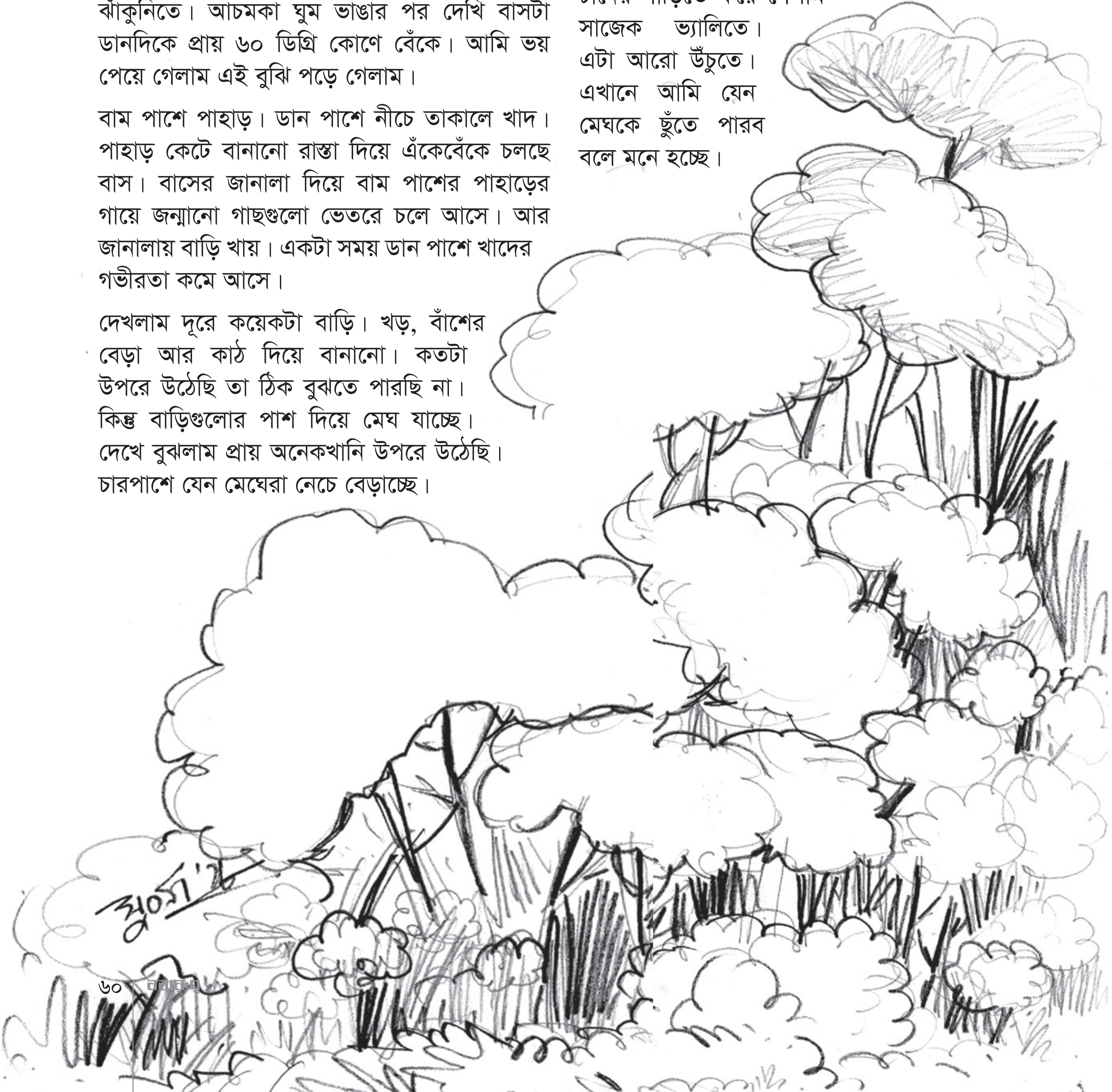

কাঠের বাড়িতে আমি কখনো থাকিনি। ঢাকায় তো আর কাঠের বাড়ি নেই। আমরা একটা কাঠের বাড়িতে উঠলাম। মা আমাকে বলল ফ্রেশ হয়ে নিতে। তারপর আমরা নাকি পাহাড়ি খাবার খাব।

আমি তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নিলাম। তারপর আমরা খেলাম বাঁশের কোরল। এটা এত মজা মনে হচ্ছে আমি যেন অমৃত খাচ্ছি। তারপর খেলাম মহিষের দুধের চা।

এত গরম সকালে। আমি ভেবেছিলাম পাহাড়ি এলাকা যেহেতু, তাই ঠান্ডা থাকবে। কিন্তু এত গরমেও আমার কোনো সমস্যা হলো না।

দেখতে গেলাম হেলিপ্যাড। সেখানে দাঁড়ালে চারপাশে শুধু ছোটো ছোটো গাছ আর বাড়ি, এত উঁচু থেকে দেখতে মনে হচ্ছে লিলিপুটের দেশ।

এর পরে গেলাম ঝরনা দেখতে। চাঁদের গাড়িতে করে আমরা ঝুলন্ত ব্রিজের সামনে নামলাম। ব্রিজটা হেঁটেই পার হতে হবে। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে দেখি মেঘ নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা ব্রিজটা পার হয়ে পৌছালাম ঝরনার সামনে। যেই ঝরনায় হাত দিলাম ওমনি জোরে ধাক্কা লাগল। তাকিয়ে দেখি আমি এখনো বাসের সিটে। পাশে পাহাড়। বাসটা ঘুরে চলছে। আর সবাই চিৎকার করছে।

তার মানে আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। বড়দি গত বছর কলেজের পিকনিকে সাজেক এসেছিল। তার সব গল্প আমায় বলেছিল। তাই তো এই ছুটিতে আমি সাজেক আসার জন্য বাবাকে বলেছিলাম। বন্ধ থাকার কারণে বাবাও রাজি হয়ে গেল। আমি এতক্ষণ বড়দির বলা গল্পগুলোই স্বপ্নে দেখছিলাম।

একটু পর আমরা খাগড়াছড়ি পৌঁছে যাবো। শুধু ঝরনার স্বপ্নটাই শেষ করতে পারলাম না। যাক বাকিটা বাস্তবেই দেখে নেব। প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা স্বপ্নের মেঘের মাঝের দেশে। মেঘেরা যেন আমায় ওয়েলকাম করছে। ওই তো মাইল স্টোনে লেখা খাগড়াছড়ি আর এক কিমি দূরে।

সপ্তম শ্রেণি, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০।

শহিদদের স্মরণে ত্রিশ লাখ গাছ রোপণ

শাহানা আফরোজ

সবুজে বাঁচি সবুজ বাঁচাই, নগর প্রাণ প্রকৃতি সাজাই–এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা–২০১৮ উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৮ই জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি ছাতিম গাছের চারা রোপণ করে প্রধানমন্ত্রী এ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। বৃক্ষমেলা উদ্‌বোধনের সময় তিনি সারাদেশে ত্রিশ লাখ গাছ লাগানোর নির্দেশ দেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের নামে প্রতীকী হবে এইসব গাছ।

সামাজিক বনায়নের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় এই ত্রিশ লাখ গাছ বিশেষ অবদান রাখবে। বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ একসময় ৭ থেকে ৯ শতাংশে নেমে আসলেও এখন বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকা ২২ শতাংশ। প্রতিবছর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বেশির কারণে বৃক্ষরোপণের মৌসুম চলে। পরিবেশবান্ধব বর্তমান সরকার তাই প্রতিবছর এ সময় সারাদেশে বৃক্ষরোপণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ত্রিশ লাখ গাছ এ কর্মসূচিরই অংশ। এছাড়া নতুন নতুন চর এবং উপকূলীয় এলাকায় সৃষ্টি করা হচ্ছে সবুজ বেস্টনী। বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা ঠেকানোর জন্য তাল ও সুপারি ইত্যাদি বজ্রপাত নিরোধক গাছ লাগানো হচ্ছে। সামাজিক বনায়নে দেয়া হচ্ছে টাকা। রাস্তার ধারে সরকারি জমি বা নিজেদের জমিতে গাছ রোপণ আর রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য অংশীদার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে এই টাকা। এ লক্ষ্যে প্রায় ৩৭১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। যার মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬ লাখেরও বেশি। এর মধ্যে এক লাখ ২১ হাজারের বেশি নারী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রিশ লাখ গাছ লাগানোর উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। কারণ এতে একদিকে যেমন দেশ সমৃদ্ধ হবে অন্যদিকে তেমনি শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ব্যতিক্রমীভাবে শ্রদ্ধা জানানো হবে। যা বিশ্বে উদাহরণ হয়ে থাকবে।

মোবাইলে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

আমাদের সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা অথবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভাতা নেওয়ার জন্য আর দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পৌঁছে যাবে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা তাঁদের নিজ নিজ মোবাইলে। এমনকি যাদের মোবাইল ফোন নেই, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদেরকে মোবাইল ফোনও কিনে দেওয়া হবে। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের যেখান থেকে ইচ্ছা টাকা তুলতে পারবেন। এ সেবা খাতে সরকারের আনুমানিক প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। পরীক্ষামূলক এ প্রকল্প চলার এক মাস পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশে এ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করবেন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্র থেকে এ তথ্য জানা যায়।

অনেক মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি ব্যাংক থেকে বেশ দূরে হওয়ায় তাঁদের যাতায়াতে বেশ বেগ পেতে হয়। আবার ব্যাংকে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাছাড়া বয়সজনিত কারণে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকের জন্য কষ্টকর। এসব ভেবেই সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

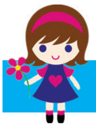

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে 'জয়'

জান্নাতে রোজী

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক সহায়তা পাওয়ার জন্য চালু হয়েছে মোবাইল অ্যাপ 'জয়'। ২৯শে জুলাই বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি অ্যাপটি উদ্‌বোধন করেন।

নির্যাতনের শিকার বা নির্যাতনের আশঙ্কা রয়েছে এমন নারী ও শিশুকে তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়ার জন্য এটুআই প্রোগ্রামের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম অ্যাপটি তৈরি করেছে।

যে কেউ গুগল অ্যাপ স্টোরের সার্চ অপশনে গিয়ে 'জয় ১০৯' লিখে সার্চ করে নিজেদের অ্যানড্রয়েড ফোনে অ্যাপটি নামিয়ে নিতে পারবেন।

অ্যাপটির মাধ্যমে ব্যবহারকারী জরুরি মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ সুপার, মহানগর এলাকার উপ-পুলিশ কমিশনার, নির্দিষ্ট তিনটি এফএনএফ নম্বর এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে (১০৯) এসএমএস পাঠাতে পারবেন। এছাড়া নির্যাতন বা সহিংসতার মুহূর্তে মোবাইলে নির্দিষ্ট জরুরি বাটন চেপে ভুক্তভোগীর জিপিএস লোকেশন, ছবি বা অডিও রেকর্ডিং মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানানো যাবে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে 'জয় অ্যাপ' সেন্টার থেকে সরাসরি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিশুবান্ধব থানা

দেশের থানাগুলোকে পর্যায়ক্রমে নারী ও শিশুবান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'জেন্ডারভিত্তিক ভায়োলেন্স থেকে শিশু ও নারীদের সুরক্ষায় টেকসই উদ্যোগ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের বিভিন্ন থানাসহ দেশের ৪টি জেলায় ৫১টি থানায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি থানা এ প্রকল্পের আওতায় আসবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা তদন্তে পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা বাড়ানো এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি চলবে।

স্বাস্থ্য : শিশু বিকাশ

ঋতু পরিবর্তনে অসুখবিসুখ

মো. জামাল উদ্দিন

আমাদের দেশ ষড়ঋতুর দেশ। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপবৈচিত্র্যে সাজে প্রকৃতি। বর্তমানে ঋতু পরিবর্তনের এই খেলায় মেতে উঠেছে আমাদের আবহাওয়া।

শরতের এই সময়টাতে দিনের বেলায় গরম ও রাতের বেলায় ঠান্ডা হাওয়া থাকে। ভাদ্র মাস শেষ হলে এই পরিবর্তনটা আরো বেশি পরিলক্ষিত হবে।

আবহাওয়ার এই তারতম্যে দেখা যায় নানারকম অসুখবিসুখের উৎপাত। এসব অসুখের বেশিরভাগই ভাইরাসজনিত এবং সাময়িক কিন্তু অস্বস্তিকর। বন্ধুরা, তোমরা একটু সতর্ক হলে এই অসুখগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারবে। ঋতু পরিবর্তনের সময় সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় সর্দি-কাশি বা কমন কোল্ড। প্রায়ই দেখা যায় দুই-তিনদিন নাক বন্ধ থাকে বা নাক দিয়ে পানি ঝরে, গলা ব্যথা করে, শুকনো কাশি থাকে, জ্বরও থাকতে পারে। এগুলো বেশিরভাগই ভাইরাসজনিত এবং এন্টিবায়োটিক ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। তবে শুকনো কাশিটা কয়েক সপ্তাহ ভোগাতে পারে। ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ, এন্টিহিস্টাসিন খেতে হবে। আর গরম পানিতে গড়গড় করতে হবে। গরম গরম চা বা গরম পানিতে আদা, মধু, লেবুর রস, তুলসি পাতার রস ইত্যাদি পান করলে উপকার পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ভাইরাসের পরপরই ব্যাক্টেরিয়া আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে কাশির সঙ্গে হলুদ বা সবুজ রঙের কফ বের হয়, বুক ব্যথা করে এবং জ্বর থাকে। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করবে।

আরেকটি ভাইরাস রোগ যাকে বলে সিজনাল ফ্লু, যার লক্ষণ কমন কোল্ডের মতোই। আলাদা কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এছাড়া আবহাওয়ার এই সময়টাতে পাতলা পায়খানাজনিত সমস্যাসহ অন্যান্য পেটের পীড়াও দেখা দিতে পারে। প্রচণ্ড গরমের সঙ্গে সঙ্গে পিপাসার কারণে রাস্তাঘাটে পানি বা শরবত খাওয়া আর নষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্য গ্রহণের ফলে প্রায়ই ডায়রিয়া দেখা দেয়। এমনকি এসব গ্রহণ করার কারণে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, জন্ডিস, সাধারণ আমাশয়, রক্ত আমাশয়ও হতে পারে। আবার তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত তাপমাত্রায় হিট স্ট্রোকের মতো জটিল রোগও দেখা দিতে পারে।

এছাড়া এ সময়ে আরেকটি ভাইরাস রোগ হতে পারে। তা হলো জলবসন্ত। প্রথমে একটু জ্বর, সর্দি, তারপর গায়ে ফোস্কার মতো ছোটো ছোটো দানা দেখা দেয়। সঙ্গে থাকে অস্বস্তিকর চুলকানি। ঢোক গিলতে অসুবিধা ও গায়ে ব্যথা থাকতে পারে। এটাও কোনো মারাত্মক অসুখ নয়। ডাক্তারের পরামর্শক্রমে প্যারাসিটামল এবং শরীর চুলকালে এন্টিহিস্টাসিন জাতীয় ওষুধ, ক্যালমিন লোশন ইত্যাদি ব্যবহার করলেই রোগের প্রকোপ কমে আসবে। তোমরা স্কুলে যাবার সময় পানির বোতল অবশ্যই সাথে রাখবে। বেশি বেশি পানি পান করবে। কোনো বাসি এবং ফুটপাতের খাবার খাবে না।

চকপাড়া আইডিয়াল পাবলিক স্কুল
স্থাপিতঃ ২০০৯খ্রিঃ
প্লে থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত
পরিচালনায়ঃ ব্রাইট স্টার হাই স্কুল, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।
চকপাড়া, মেডিকেল মোড়, শ্রীপুর, গাজীপুর। মোবাঃ ০১৭৪৫-১৫৭৬৪৯, ০১৭২৩-১৬৯৯৯৫
সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর

সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি

আমাদের নবারুণ বন্ধু নিতু অনেক সুন্দর একটি কাজ করেছে। যার জন্য আজ নিতুকে নিয়ে আমাদের লিখা। আর এ সম্পর্কে নিতুর বাবা তাঁর ফেসবুক পাতায় লিখেছেন, নিতু নবারুণ পত্রিকায় অনেকদিন থেকেই লেখালেখি করছে। সে নিজে তো লিখেই। এখন নিতু তার স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শুরু করেছে লেখক তৈরির কাজ। সবাইকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে গল্প, কবিতা, ছড়া লিখিয়ে নিচ্ছে। অঁজ পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট একটি স্কুলে নিতু পড়ে। এই ছোট্ট মেয়েটির প্রচেষ্টায় যদি একটি ছেলে বা মেয়েও স্বপ্ন দেখে যে আমি লেখক হব, তবেই না পাওয়ার খাতায় কিছু যোগ হতে পারে।

নিতু যেমন নবারুণ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এত সুন্দর একটি কাজ করেছে তেমনি বন্ধু তোমরাও এমন কিছু সুন্দর সুন্দর কাজের মাধ্যমে আমাদেরকে তা জানাতে পারো। নিতুর বাবা নবারুণ পত্রিকা ও সম্পাদক মহোদয়কে বার বার ধন্যবাদ জানিয়েছেন নিতুর লেখা প্রকাশের জন্য।

ফেসবুক মতামত

1. Rahat Rabbany: নিতুরা থেমে থাকে না।
2. Rukunaz Zaman: অভিনন্দন, নিতু মা। শুভ কামনা রইল তোমার এবং তোমার বন্ধুদের জন্য।
3. Kofli Uddin: নিতুর বাবার মতো অভিভাবক খুবই কম আমাদের সমাজে। সকল অভিভাবক সচেতন হলে এগুলোর বাস্তবায়ন সহজতর হতো।

আমাদের আর একজন ছোট্টবন্ধু স্বপ্নীল। স্বপ্নীল রাজশাহীর ব্লু বার্ড প্রিপারেটরি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। সে ছোট্টবেলা থেকেই বই পড়তে খুব পছন্দ করে। সে নবারুণ পড়তেও খুব ভালোবাসে। তার বাবা অনেক বই ও নবারুণ এনে দেয় পড়ার জন্য। স্বপ্নীলের খুব শখ যে তার একটি লেখা নবারুণে ছাপা হোক। তাই সে একটি মতামত পাঠিয়েছে। মতামতটি স্বপ্নীলের ভাষায় দেওয়া হলো: ‘নবারুণ পড়ে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আমি সবাইকে বলতে চাই যে নবারুণ পড়ে শুধু দেশের নয় বিদেশেরও অনেক খবর জানা যায়। জানা-অজানা অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। তাই আমি সবাইকে বলতে চাই আপনারা নিয়মিত নবারুণ পড়বেন।

ইতি স্বপ্নীল’।

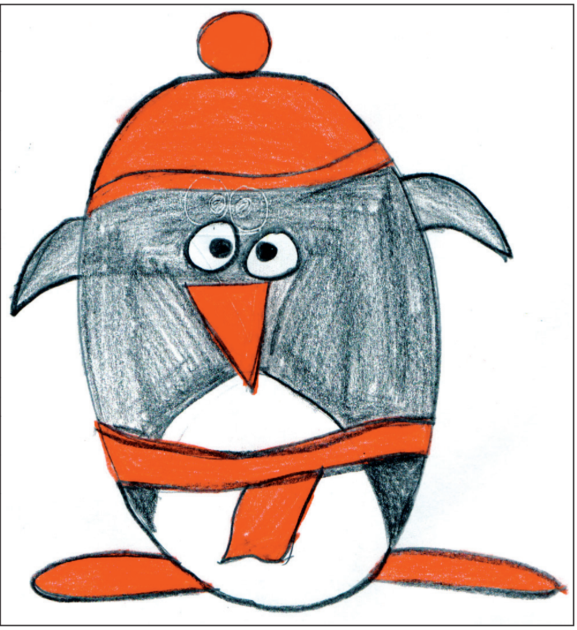

আয়ান হক ভূঁঞা, প্লে শ্রেণি
স্টার হাতেখড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, রামপুরা, ঢাকা